সিদ্ধার্থ

হেরমান হেস

সিদ্ধার্থ

অনুবাদক : শীলভদ্র



কে. এল. মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
কে. এল. মুখোপাধ্যায়
৬।১।এ, বাঞ্ছারাম অক্রূর লেন
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট :
শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর :
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
শ্রীভারতী প্রেস
৬৪-এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

পরিবেশক :
এম সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দাম—তিন টাকা

সিদ্ধার্থ বলতে আমরা সাধারণতঃ যাঁকে বুঝি হেসের নায়ক কিন্তু তিনি নন্। অবশ্য কাহিনীর পটভূমিকায় বুদ্ধের অদৃশ্য উপস্থিতি সব সময়েই অনুভব করা যায়,—কাহিনীর মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই মাত্র একবার।

হেসের নায়ক এক তরুণ ব্রাহ্মণ কুমার। শাস্ত্র পাঠ এবং যাগযজ্ঞ কিছুই তাকে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারল না। তাই সে গৃহ ত্যাগ করে বনে গেল, সকল প্রকার কঠোর তপশ্চর্যায় পারদর্শী হলো। কিন্তু তবু উত্তর পেল না জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং জীবন অনিবার্যরূপে যে বেদনার বোঝা নিয়ে আসে তার হাত থেকেই বা মুক্তি পাওয়া যাবে কোন পথে?

বুদ্ধের উপদেশ শুনে ভালো লাগল, তবু সিদ্ধার্থ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল না। কারণ গুরুবাদে তার আস্থা নেই। জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস ত্যাগ করে লোকালয়ে ফিরে এলো। এতদিন সাধনা করেছে বৈরাগ্যের, এবার সংসার-জীবনের আনন্দ-বেদনার পরিচয়টা পেতে হবে। নগরে এসে রূপোপজীবিনী কমলার কাছ থেকে প্রেমের প্রথম পাঠ গ্রহণ করল, এবং তারই সাহায্যে হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠা। কিছু কাল চরম বিলাসিতায় কাটিয়ে হঠাৎ একদিন জীর্ণ বস্ত্রের মতো সব ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ল সিদ্ধার্থ। এক খেয়াঘাটের বৃদ্ধ মাঝির আমন্ত্রণে তার কুটিরে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিল। তার জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর এতদিনে খুঁজে পেল মাঝি

বাসুদেব ও নদীর কাছ থেকে। জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধার্থের মোটামুটি উপলব্ধি এই: জীবনের পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয়, অন্যের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায় না। গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা শিক্ষা করা যায়, জ্ঞান পাওয়া যায় না। সংসারে দুঃখের গোড়ার কথা হলো সময়কে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ভাগ করে দেখবার চেষ্টা। আসলে কালপ্রবাহ এক ও অবিভাজ্য। নদী উৎপত্তি স্থান থেকে মোহনা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান; এই জলধারার যেমন অতীত ও ভবিষ্যৎ নেই তেমনি মহাকালকেও অতীত ও ভবিষ্যতে খণ্ডিত করা চলে না। প্রিয় জিনিস হারাবার ভয়ে কত দুঃখ পাই; আসলে নদীর জলের মতো বিশ্বের কোন জিনিসই হারায় না। নদীর জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, মেঘ সৃষ্টি করে, আবার বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে। জীবনের স্রোত এমনি অবিশ্রাম ধারায় বয়ে চলেছে; এর মধ্যে পাপ ও পুণ্য, ভালো ও মন্দ, মানুষ ও পশুর মিলন ঘটেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেও যিনি ঐক্য দেখতে পান, সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সংসারকে যিনি ভালোবাসতে পারেন, জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

'সিদ্ধার্থের' মতো দার্শনিক উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে নেই। অনুবাদ করতে গিয়ে দার্শনিক প্রতিশব্দের জন্য বারবার থামতে হয়েছে। বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার না করে অনুবাদ করা সম্ভব ছিল না। তাই অনুবাদের ভাষা আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের ভাষা হতে পারেনি। 'সিদ্ধার্থের' কাহিনী সাধারণ উপন্যাসের মতো নয়,—এটাই এই ব্যতিক্রমের সবচেয়ে বড় কৈফিয়ৎ।

সিদ্ধার্থ

ব্রাহ্মণকুমার

সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণকুমার সিদ্ধার্থ তার বন্ধু গোবিন্দের সাহচর্যে বড় হয়ে উঠ্ছে। গৃহাঙ্গনে, রৌদ্রালোকিত নদীতীরে, শাল ও ডুমুর গাছের ছায়ায় দু'জনে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। শুচি স্নান এবং যজ্ঞোপলক্ষে নদীতীরে যাতায়াত করে-করে সিদ্ধার্থের অনতিপ্রশস্ত কাঁধ বাদামী রঙ ধরেছে। আম বাগানে খেলা করবার সময়, মা'র গান শুনে, পিতার অধ্যাপনা শুনতে বসে এবং মনীষীদের সাহচর্যে তার চোখের সম্মুখ দিয়ে কিসের যেন ছায়া ভেসে যায়। এর মধ্যেই সিদ্ধার্থ পণ্ডিতদের আলোচনায় যোগ দিয়েছে, তাই নিয়ে আবার গোবিন্দের সঙ্গে তর্ক করেছে, আর অভ্যাস করেছে একাগ্র চিন্তা ও ধ্যানের। কুম্ভকের সাহায্যে শব্দশ্রেষ্ঠ 'ওম্' নিঃশব্দে উচ্চারণ করবার কৌশলটাও সে আয়ত্ত করেছে; প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার সময় বিশুদ্ধ আত্মার প্রভায় তার ললাট দীপ্ত হয়ে ওঠে। যে আত্মা অবিনশ্বর, যে আত্মা নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই আত্মাকে আপন সত্তার গভীরে উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও লাভ করেছে সিদ্ধার্থ।

পুত্রের ধীশক্তি ও জ্ঞানতৃষ্ণা দেখে পিতার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায় ; তিনি স্বপ্ন দেখেন, ছেলে একদিন বড় পণ্ডিত হয়ে উঠবে, পুরোহিত হবে, খ্যাতি লাভ করবে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হিসেবে। তার চলা, বসা, ওঠা, দু'চোখ ভরে দেখে দেখে মায়ের মন গর্বে ভরে ওঠে ; সবল, সুদর্শন, সুকুমারকান্তি সিদ্ধার্থ কি লাবণ্য-মধুর ভঙ্গীতে তাঁকে প্রণাম করে !

সিদ্ধার্থ যখন নগরপথে চলে তখন তার উন্নত ললাট, রাজোচিত চক্ষু, একহারা গঠন দেখে ব্রাহ্মণ কুমারীদের হৃদয়ে প্রেমের স্পন্দন জাগে।

কিন্তু তার বন্ধু ব্রাহ্মণকুমার গোবিন্দের মতো আর কেউ সিদ্ধার্থকে ভালোবাসে না। সিদ্ধার্থের চোখ, সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর তার ভালো লাগে। সে ভালোবাসে তার হাঁটার ধরন, গতি-ভঙ্গীর পরিপূর্ণ মাধুর্য। সিদ্ধার্থ যে কাজ করে, যে কথা বলে সবই ভালো লাগে গোবিন্দের ; তাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করে সিদ্ধার্থের মেধা, উদ্দীপনাময় চমৎকার চিন্তাধারা, দৃঢ় সংকল্প এবং তার জীবনের মহৎ লক্ষ্য। গোবিন্দ জানে সিদ্ধার্থের জীবন আর পাঁচজন সাধারণ ব্রাহ্মণের মতো হবে না, যজ্ঞের অলস হোতা হয়ে দিন কাটানো তার উদ্দেশ্য নয় ; মন্ত্রতন্ত্রের অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ী, যোগ্যতাহীন দাম্ভিক বক্তা, দুর্নীতিপরায়ণ শঠ পুরোহিত সে হবে না ; অথবা বৃহৎ পালের মধ্যে নির্বোধ গোবেচারা ভেড়ার মতো তার জীবন কাটবে না,—এও

নিশ্চিন্ত। গোবিন্দ নিজেও ওসব পথে যেতে চায় না; হাজার হাজার ব্রাহ্মণের একজন হয়ে থাকতে তার আকাঙ্ক্ষা নেই। সে অনুগামী হবে তার প্রিয় বন্ধুর, মহৎ-হৃদয় সিদ্ধার্থের। যদি সাধনার দ্বারা সে দেবত্ব লাভ করে, যদি জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়, তাহ'লে গোবিন্দ তার অনুসরণ করবে। অনুগমন করবে বন্ধু, সাথী, ভৃত্য ও দেহরক্ষী হিসেবে; ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

এমনি করে সবাই সিদ্ধার্থকে ভালোবাসে। সে আনন্দ দেয়, সুখ দেয় সকলকে।

কিন্তু সিদ্ধার্থের নিজের মনে সুখ নেই। সে সকলের প্রিয়, সকলের আনন্দের উৎস; পাকা ফল ছড়ানো ডুমুর বাগানের লাল পথে সিদ্ধার্থ ঘুরে বেড়ায়, কুঞ্জের নীলাভ ছায়ায় বসে ধ্যান করে; প্রতি দিন পুণ্য সলিলে অবগাহন করে প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য; আম বাগানের গভীর ছায়ায় বিনীত-মধুর ভঙ্গীতে নৈবেদ্য নিবেদন করে; কিন্তু তবু তার হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি নেই। ঐ নদী, রাত্রির আকাশে মিট্‌মিটে তারা, সূর্যের প্রখর কিরণ তার মনে চাঞ্চল্য জাগায়, স্বপ্ন রচনা করে। যজ্ঞের ধোঁয়া, ঋগ্‌বেদের স্তোত্র, প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদের শিক্ষা, তার হৃদয় ব্যাকুল করে তোলে, স্বপ্ন দেখে অন্য জগতের।

সিদ্ধার্থ অনুভব করে তার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠছে

একটা অতৃপ্তির বীজ। সে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে পিতা-মাতার স্নেহ, বন্ধুর ভালোবাসা তাকে চিরদিন আনন্দ দেবে না, দেবে না শান্তি ; শুধু এই দিয়ে সে তৃপ্ত হবে না, পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে না। তার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। সুপণ্ডিত পিতা এবং অন্যান্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আচার্যের কাছ থেকে এর মধ্যেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের বৃহৎ অংশ সে লাভ করেছে। এঁরা সিদ্ধার্থের অপেক্ষমান জাহাজে তুলে দিয়েছেন তাঁদের মিলিত জ্ঞানের ভাণ্ডার ; কিন্তু জাহাজ পূর্ণ হয়নি, বুদ্ধির তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই আত্মার, হৃদয়ের চাঞ্চল্য ঘোচেনি। পুণ্য সলিলে অবগাহন ভালো ; কিন্তু জল দিয়ে তো পাপ ধুয়ে ফেলা যায় না, লাঘব করা যায় না হৃদয়ের ভার। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানানো, খুবই উত্তম ব্যবস্থা ; কিন্তু তাই কি যথেষ্ট ? দেবতাদের সম্বন্ধেই বা কি জানি ? সত্যি কি প্রজাপতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন ? অথবা একমাত্র পরমাত্মা, পরম ব্রহ্মের সৃষ্ট এই জগৎ ? তোমার আমার মতো যারা মৃত্যুর বলি, যারা অচিরস্থায়ী, তাদের আকৃতি দিয়েই কি দেবতার সৃষ্টি করা হয় নি ? তাহ'লে দেবতাদের পূজা করে লাভ কি ? সেটা কি উচিত ও যুক্তি সঙ্গত ? যিনি একমেব অদ্বিতীয়ম্‌ যিনি পরমাত্মা ও পরম ব্রহ্ম, একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কার উদ্দেশ্যে যজ্ঞের আয়োজন করা যায় ? আর কে পেতে পারে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য ? আমাদের

অন্তরের গভীরতম অমর সত্তায় যদি পরমাত্মার সাক্ষাৎ না পাই, তাহ'লে ঈশ্বর কোথায় আছেন, কোথায় তাঁর শাশ্বত হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যাবে? কোথায় সেই অন্তর্নিগূঢ় ব্যক্তিসত্তা? যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা বলেন যে অস্থিমাংসে আত্মা নেই, নেই চিন্তা ও চেতনায়। তাহ'লে আছে কোথায়? আত্মাকে উপলব্ধি করবার আর কোন সফলতর পথ আছে? কেউ পথ নির্দ্দেশ করে না। তার পিতা, আচার্যমণ্ডলী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কেউ জানেন না পথের কথা। পবিত্র স্তোত্রেও নেই কোন ইঙ্গিত। ব্রাহ্মণরা সকল বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন; তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থে সবকিছুর উল্লেখ আছে। সৃষ্টিরহস্য, ভাষার জন্ম, খাদ্য, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অবস্থান, দেবতাদের লীলা,—সবই তাঁরা আলোচনা করেছেন। তাঁরা এত জিনিস জানতেন যে তার সংখ্যাটা রীতিমতো ভীতিজনক। কিন্তু এই জানার মূল্য কি যদি না সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটি জানা যায়,—সবকিছুর মধ্যে যেটি একমাত্র মূল্যবান?

শাস্ত্রগ্রন্থে, বিশেষ করে সামবেদীয় উপনিষদের অনেক শ্লোকে, এই অন্তরবাসী সত্তার উল্লেখ আছে। এ সব গ্রন্থের উপদেশ: "আত্মৈ বেদং সর্বম্।" উপনিষদে বলা হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়লে অন্তর্নিহিত আত্মার মধ্যে আমরা বাস করি; দেহ ঘুমায়, জেগে ওঠে আত্মা। এই সব শ্লোকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে আশ্চর্য জ্ঞান; ঋষিদের সাধনালব্ধ সকল

জ্ঞান এখানে ব্যক্ত হয়েছে মনোমুগ্ধকর ভাষায়; মৌমাছির সংগৃহীত মধুর মতোই তা বিশুদ্ধ। পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণরা যে বিপুল পরিমাণ জ্ঞান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে আসছেন তাকে সহজে অগ্রাহ্য করা চলে না। কিন্তু কোথায় সেই ব্রাহ্মণ, পুরোহিত এবং পণ্ডিতের দল যাঁরা শুধু বইয়ের পৃষ্ঠায় সুগভীর জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করেন নি, জীবনেও তাদের উপলব্ধি করেছেন? এমন দীক্ষা কার আছে যিনি নিদ্রার মধ্যে আত্মাকে লাভ করে তাকে জাগরণে, জীবনে, বাক্যে, কার্যে এবং সর্বত্র ধরে রাখতে পারেন? সিদ্ধার্থ অনেক সুযোগ্য ব্রাহ্মণ দেখেছে। দেখেছে তার পিতাকে,—ধর্মপরায়ণ, বিদ্বান, সর্বোত্তম সম্মানের যোগ্য। পিতার সম্মুখে গেলেই মন শ্রদ্ধায় নত হয়, তাঁর ব্যবহার শান্ত ও মহৎ। সৎপথে তিনি চলেন, তাঁর বাক্য বিজ্ঞ-জনোচিত। কত সূক্ষ্ম ও মহৎ চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্ক পূর্ণ,—কিন্তু এত জেনেও তিনি কি অতৃপ্ত তত্ত্বানুসন্ধানী নন? অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে তিনিও কি নিয়ত পূত সলিলে, যজ্ঞভূমিতে, ব্রাহ্মণদের আলোচনা সভায় এবং গ্রন্থ পাঠ করতে যান না? অনিন্দ্য-চরিত্র তার পিতাকেও কেন প্রত্যহ দেহ প্রক্ষালন করে বিশুদ্ধ হয়ে পাপ ধুয়ে দূর করবার চেষ্টা করতে হবে? তাহ'লে তাঁর মধ্যে কি আত্মার অস্তিত্ব নেই? আদি কারণ কি তাঁর হৃদয়ের মধ্যে নিহিত নেই? নিজের গভীর সত্তার মধ্যেই তো সবকিছুর মূল কারণ রয়েছে; তাকে জানতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে।

এ ছাড়া আর যা কিছু সব হলো শুধুই খোঁজা,—গোলক-ধাঁধাঁ, ভ্রান্তি।

সিদ্ধার্থের এই ছিল ভাবনা; এই ছিল তা'র আকাঙ্ক্ষা; তার দুঃখ।

সে প্রায়ই আপন মনে ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্লোকাংশ আবৃত্তি করেঃ "এতদমৃতম ভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি॥...অহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি॥" ব্রহ্মই সত্য; একথা যিনি জানেন প্রতিদিনই তিনি ব্রহ্মলোক গমন করেন। এই ব্রহ্মলোক অনেক সময় খুব নিকটে মনে হয়, কিন্তু সেখানে ঠিক পৌঁছতে পারেনি কখনো, মেটানো হয়নি চরম তৃষ্ণা। সিদ্ধার্থ যে সব পণ্ডিতদের জানে, যাঁদের শিক্ষা তার ভালো লাগে তাঁদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মলোকে পৌঁছেছেন, কেউ নেই যাঁর অনন্ত তৃষ্ণা পরিপূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছে।

সিদ্ধার্থ তার বন্ধুকে বলল, "গোবিন্দ, চলো বটগাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। কিছুক্ষণ ধ্যান করা যাক।"

বট গাছের তলায় এসে বিশ পা ব্যবধানে দু'জন বসল। গোবিন্দ ওম্ উচ্চারণ করবার উদ্যোগ করতেই সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে আবৃত্তি আরম্ভ করলঃ

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

ওম্ হলো ধনু, জীবাত্মা তীর এবং ব্রহ্ম হলেন লক্ষ্য। নির্ভুল ভাবে লক্ষ্য ভেদ করতে পারলে তীর ও লক্ষ্যের মিলন ঘটবে। অর্থাৎ, জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হবে।

সাধারণ রীতি অনুযায়ী ধ্যানের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে; গোবিন্দ উঠে দাঁড়াল। এখন সন্ধ্যা; সময় হয়েছে আহ্নিকের। সে সিদ্ধার্থের নাম ধরে ডাকল, কিন্তু সাড়া নেই। সিদ্ধার্থ তন্ময় হয়ে কোন এক বহু দূরবর্তী লক্ষ্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে; দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় জিহ্বার অগ্রভাগটুকু। এমন স্থির মূর্তি,—মনে হয় শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। এমনি করেই ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে সিদ্ধার্থ, ভাবছে শুধু ওম্ আত্মার বাণ নিবদ্ধ করা হয়েছে একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্মের দিকে।

একবার একদল সাধু ঘুরতে ঘুরতে সেই নগরে এসে উপস্থিত হলো। তিন জন কৃশকায়, শ্রান্ত, ভবঘুরে সন্ন্যাসী, চেহারা থেকে বোঝবার উপায় নেই বৃদ্ধ কি যুবক। তাদের উলঙ্গপ্রায় ধূলি-মাখা রক্তাক্ত দেহ সূর্যের উত্তাপে ঝলসে গেছে। এরা নিঃসঙ্গ, অদ্ভুত,—সর্বদা যেন মুখ খিঁচিয়েই আছে; মানুষের পৃথিবীতে তারা ক্ষুধার্ত শেয়ালের মতো। তাদের চার পাশে স্তব্ধ আকাঙ্ক্ষার পরিবেশ; আত্মক্ষয়কারী সেবার ব্রত এবং নির্দয় আত্মনিগ্রহের আদর্শ তাদের।

সন্ধ্যাবেলা ধ্যান ভাঙবার পর সিদ্ধার্থ গোবিন্দকে বলল, "শোন বন্ধু, কাল সকালে সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেবে ; সে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।"

সিদ্ধার্থের কথা শুনে গোবিন্দের মুখ শাদা হয়ে গেল। সে বন্ধুর সঙ্কল্প-কঠিন মুখে সিদ্ধান্তের রেখা পাঠ করল ; জ্যা-মুক্ত তীরের মতো তাকে আর ফেরানো যাবে না। বন্ধুর মুখের দিকে চেয়েই গোবিন্দ অনুভব করতে পারল এবার সিদ্ধার্থের নিজের পথে যাত্রা শুরু হয়েছে, ভাগ্যের পটপরিবর্তন আরম্ভ হলো এখন থেকে। সিদ্ধার্থের সঙ্গে গোবিন্দের নিজের জীবনও নতুন পথে যাত্রা করবে। অজানা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় গোবিন্দের মুখ শুকনো কলার খোসার মতো বিবর্ণ হয়ে উঠল।

গোবিন্দ বলে উঠল, "কিন্তু সিদ্ধার্থ, তোমার বাবা কি অনুমতি দেবেন ?"

যেন এই মাত্র ঘুম ভেঙেছে এমনি চোখে সিদ্ধার্থ গোবিন্দের দিকে চাইল। বিদ্যুৎগতিতে সে বুঝতে পারল গোবিন্দের মনোভাব। অনুভব করল তার আশঙ্কা, তার আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত।

সে ধীরে ধীরে বলল, "গোবিন্দ, এ বিষয়ে আর বৃথা বাক্য ব্যয় করব না। কাল সকালে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব। এ নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না।"

পিতা যে ঘরে কুশাসনের উপরে বসে জপ করছেন সেখানে

চলে এল সিদ্ধার্থ। তার উপস্থিতি বুঝতে না পারা পর্যন্ত সে নীরবে পিতার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক সময় ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কে, সিদ্ধার্থ? বলো, কি বলতে এসেছ।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "পিতা, আপনার অনুমতি পেলে গৃহ ত্যাগ করে কাল আমি সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেব। আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করতে চাই। জানি, আপনার অমত হবে না।"

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। ঘরের ছোট জানালা দিয়ে দেখা গেল তারার দল রাত্রির আকাশে নতুন নকশা রচনা করছে। পুত্র দুই বাহু বুকের উপর নিবদ্ধ করে নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিতা প্রস্তর মূর্তির মতো কুশাসনের উপর বসে আছেন; বাইরে তারার দল ধীরে ধীরে আকাশের পথ অতিক্রম করে চলছে। বহুক্ষণ পরে পিতা বললেন, "আমার হৃদয় অসন্তোষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে; কিন্তু ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত বাক্য উচ্চারণ করা ব্রাহ্মণদের পক্ষে শোভা পায় না। দ্বিতীয় বার এই অনুরোধ তোমার মুখ থেকে যেন শুনতে না পাই।"

ব্রাহ্মণ আসন ছেড়ে উঠলেন। সিদ্ধার্থ তখনো তেমনি নীরবে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছে।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের জন্য অপেক্ষা করছ?"

বিনীত কণ্ঠে সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "আপনি তা জানেন।"

ব্রাহ্মণ রুষ্ট হয়ে চলে গেলেন ; নিদ্রার সময় হয়েছে। শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল, ঘুম আসে না। ব্রাহ্মণ শয্যা ত্যাগ করে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ঘরের বাইরে এলেন। ছোট জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন পাশের ঘরে সিদ্ধার্থ তখনও বুকের উপর দুই বাহু নিবদ্ধ করে প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার শাদা কাপড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্ধকার ঘরে। অন্তরে বেদনা বোধ করলেন, ফিরে গেলেন শয্যায়।

আর এক ঘণ্টা গেল ; তবু চোখে ঘুম নেই। আবার উঠে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বাইরে এলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে। জানালা দিয়ে দেখা গেল সিদ্ধার্থ ঠিক তেমনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই বাহু বুকের উপর নিবদ্ধ করে। তার পায়ে এসে পড়েছে চাঁদের আলো। ব্রাহ্মণের হৃদয় ব্যথায় ক্লিষ্ট হলো, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এক ঘণ্টা পরে আবার এলেন ; আবার দু'ঘণ্টা পরে। জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন কখনো চন্দ্রালোকে, কখনো তারার আলোয়, কখনো বা অন্ধকারে সিদ্ধার্থ ঠিক একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি নীরবে এসে জানালা দিয়ে দেখে যান সিদ্ধার্থের নিশ্চল মূর্তি। তাঁর হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হয়ে যায় ; মন ভারাক্রান্ত হয় উৎকণ্ঠায়, ভয়ে ও বেদনায়।

রাত্রির শেষ প্রহরে, ভোর হবার আগে, ব্রাহ্মণ আর এক

বার এলেন ; ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন পুত্র ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন এরই মধ্যে মাথায় লম্বা হয়ে উঠেছে ; এ যেন চির-পরিচিত সিদ্ধার্থ নয়,—আর কেউ।

জিজ্ঞাসা করলেন, "সিদ্ধার্থ, কেন অপেক্ষা করছ ?"

"কেন তা আপনি জানেন।"

"ভোর হবে, দিন গড়িয়ে যাবে দুপুর ও সন্ধ্যায়, তবু কি দাঁড়িয়ে থাকবে ?"

"আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব।"

"সিদ্ধার্থ, তুমি ক্লান্ত হবে।"

"হ্যাঁ, হবো।"

"তুমি ঘুমিয়ে পড়বে, সিদ্ধার্থ।"

"না, ঘুম আসবে না।"

"তোমার মৃত্যু হবে।"

"তা হবে।"

"মৃত্যু কি পিতার আদেশ পালনের চেয়েও বরণীয় তোমার কাছে ?"

"সিদ্ধার্থ কোনদিন পিতার অবাধ্য হয়নি।"

"তাহ'লে তোমার সঙ্কল্প ত্যাগ করলে ?"

"পিতা যা আদেশ করবেন সিদ্ধার্থ তাই করবে।"

প্রভাতের প্রথম কিরণ প্রবেশ করেছে ঘরে। ব্রাহ্মণ দেখলেন সিদ্ধার্থের হাঁটু সামান্য একটু কাঁপছে ; কিন্তু তার

মুখ অচঞ্চল ; চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে বহু দূরে। পিতা উপলব্ধি করলেন পুত্র এই গৃহে তাঁর সঙ্গে আর থাকতে পারবে না ; এর মধ্যেই সে তাঁকে ত্যাগ করে দূরে চলে গেছে।

ব্রাহ্মণ পুত্রের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বেশ, তুমি বনে যাও, সন্ন্যাস গ্রহণ কর। বনে যদি সেই পরমানন্দ লাভ করতে পার তাহ'লে আমাকে ভাগ দিয়ে যেও। যদি না পাও, তাহ'লেও ফিরে এসো ; আবার আমরা দু'জনে এক সঙ্গে দেবতার আরাধনা করব। এখন যাও, মাকে প্রণাম কর ; তাঁকে বল কোথায় চলেছ। আমার তো প্রাতঃস্নানের সময় হয়েছে, এবার নদীর ঘাটে যাই।"

পুত্রের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ব্রাহ্মণ বাইরে চলে গেলেন। দীর্ঘকাল স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম পা ফেলবার উদ্যোগ করতেই সিদ্ধার্থের দেহ দুলে উঠল ; নিজেকে সংযত করে পিতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সে গেল মা'র সন্ধানে।

প্রত্যূষের প্রায়ান্ধকারে ধীরে ধীরে অসাড় পা ফেলে নিদ্রিত নগরী ত্যাগ করে চলেছে সিদ্ধার্থ। নগরীর শেষ কুটীর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে এলো একটি ছায়া, সঙ্গ নিল অভিযাত্রীর। সে ছায়া গোবিন্দের।

মৃদু হেসে সিদ্ধার্থ বলল, "তুমি এসেছ দেখছি।"

"হ্যাঁ, আমি এলাম।"

পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বলল গোবিন্দ।

সন্ন্যাস

সেদিন বিকেলেই তারা সাধুদের নাগাল পেয়ে গেল। আনুগত্য স্বীকার করে অনুরোধ জানাল দলে ভর্তি করে নিতে। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো তাদের।

একটি কৌপীন এবং সেলাই-বিহীন গেরুয়া রঙের অঙ্গাবরণ মাত্র রেখে সিদ্ধার্থ তার সকল পোষাক বিলিয়ে দিয়েছে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে। দিনে এক বেলা মাত্র খায়, সে খাদ্যেও আবার আগুনের ছোঁয়া লাগবে না। তারপর শুরু হলো উপবাস; প্রথম চোদ্দ দিন; ক্রমে বেড়ে হলো আটাশ দিন। গাল থেকে, পা থেকে, মাংস গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে। সিদ্ধার্থের বড় বড় বেরিয়ে-আসা চোখে কত অদ্ভুত স্বপ্নের ছায়া ভেসে ওঠে। তার ক্ষীণ আঙুলের নখগুলি দীর্ঘ হয়েছে, চিবুকে দেখা দিয়েছে শুকনো কাঁটা কাঁটা দাড়ি। মেয়েদের সামনে পড়লে তার দৃষ্টি হয়ে ওঠে বরফের মতো শীতল; সুসজ্জিত নরনারী পূর্ণ নগরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তার ঠোঁট অবজ্ঞায় কুঞ্চিত হয়। সিদ্ধার্থ দেখত ব্যবসায়ীরা বেচাকেনা করছে, দেহের পণ্য সাজিয়ে বসে আছে গণিকারা, বৈদ্য চিকিৎসা

করছে রোগীর, পুরোহিত বীজ বপনের শুভদিন দেখছে, প্রেমিক প্রেম নিবেদন করছে, মা সন্তানকে শান্ত করছে,—কিন্তু এসব কোন দৃশ্যই মুহূর্তের জন্য চেয়ে দেখবারও যোগ্য নয়। কিছুই সত্য নয়,—মিথ্যার উৎকট দুর্গন্ধে এরা বিষাক্ত। আনন্দ আর সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের মায়া কেবল। সব একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সংসার বিস্বাদ ঠেকে। জীবন শুধু বেদনা।

সিদ্ধার্থের একটিমাত্র লক্ষ্য—শূন্য হয়ে যাওয়া; তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, আনন্দ ও বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়া, অহংকে মরে যেতে দেওয়া। অহংকে দমন করে নিরাসক্ত হৃদয়ের শান্তি ও বিশুদ্ধ চিন্তার অভিজ্ঞতা অর্জন করা তার একমাত্র লক্ষ্য। অহং যখন পরাজিত ও মৃত, যখন সকল বিক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা শান্ত হবে, তখন সেই অহংমুক্ত অন্তরবাসী গোপন সত্তা জেগে উঠবে।

প্রখর রৌদ্রে সিদ্ধার্থ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, কষ্টে ও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়; কিন্তু তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না তৃষ্ণা ও বেদনার অনুভূতি লোপ পায়। এমনি করে বৃষ্টিতেও দাঁড়িয়ে থাকে; মাথার চুল থেকে জল গড়িয়ে পড়ে কাঁধে; সেখান থেকে কোমর ও পায়ে। ঠাণ্ডায় দেহ জমে যায়; নবীন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না ঠাণ্ডা আর গায়ে লাগে না, যখন কাঁধ ও পা অনুভূতির বাইরে চলে যায়, প্রবল হিমেও যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শীতে জমে না, যখন তারা শান্ত হয়ে

পড়ে, স্পর্শানুভূতির বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। সিদ্ধার্থ কাঁটার আসনের উপর বসা অভ্যাস করে; ব্যথা-ক্লিষ্ট ছিন্ন চামড়া থেকে রক্ত ঝরে, ঘা হয়, কিন্তু সিদ্ধার্থ অটল, অচঞ্চল হয়ে বসে থাকে। রক্তঝরা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত, কাঁটাবেঁধার অনুভূতি এবং তার বেদনাবোধ দূর না হওয়া পর্যন্ত, সে কণ্টকাসন ত্যাগ করে না।

সিদ্ধার্থ প্রাণায়াম আরম্ভ করেছে। ক্রমশঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কম নেওয়া অভ্যাস করে করে শ্বাস রুদ্ধ করেও থাকতে পারে অনেকক্ষণ। বাতাস গ্রহণ করবার সময় যাতে হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ থাকে তার সাধনা করতে করতে সে প্রায় সফলতা লাভ করেছে।

বয়োজ্যেষ্ঠ সাধুর উপদেশ অনুসারে সিদ্ধার্থ ধ্যান ও আত্মনিগ্রহ শিক্ষা করে। হয়তো বাঁশবনের উপর দিয়ে যাচ্ছে একটা বক, সিদ্ধার্থের আত্মা গিয়ে প্রবেশ করল তার মধ্যে; কত বন আর পর্বতের উপর দিয়ে উড়ে এল; বক হয়ে মাছ খেল, বকের ক্ষুধায় কাতর হলো। ভাষা ব্যবহার করল বকদের, তারপর মৃত্যু হলো বকদের মতোই। বালুকীর্ণ নদী তীরে পড়ে ছিল একটা মরা শেয়াল, সিদ্ধার্থের আত্মা গিয়ে ঢুকল সেই মৃতদেহে। নদীতীরে মরা শেয়াল হয়ে পড়ে রইল সে; ফুলে উঠল, ছড়াতে লাগল দুর্গন্ধ, পচন শুরু হলো, চিতাবাঘ টুকরো টুকরো করল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ঘা খেল শকুনের ধারালো ঠোঁটের, ক্রমে কঙ্কালসার হয়ে পড়ল, তারপর ধূলা

হয়ে মিলিয়ে গেল। সিদ্ধার্থের আত্মা ফিরে এল, ফিরে এল মৃত্যু, পচন ও ধূলির মধ্য দিয়ে; ফিরে এল জীবনচক্রের বেদনাময় অভিজ্ঞতা লাভ করে। শিকারীর নব নব শিকারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল এক বিরাট শূন্যতার তীরে, যেখানে জীবনচক্রের বিবর্তন বন্ধ হয়েছে, যেখানে হেতুবাদ নীরব, যেখান থেকে শুরু হয়েছে বেদনাবোধহীন অনন্ত সত্তা। সে ইন্দ্রিয় দমন করেছে, স্মৃতির সঞ্চয়কে ধ্বংস করেছে, হাজারো বিভিন্ন রূপ নিয়ে নিজের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে কত বার। জন্তু, শব, পাথর, কাঠ ও জলের রূপ নিয়েছে সিদ্ধার্থ, আবার প্রত্যেকবার জেগে উঠেছে নিজের মধ্যে। জীবনচক্রের দোলায় দুলে সে আবার ফিরে এসেছে আপন সত্তায়, তৃষ্ণা পেয়েছে, দমন করেছে তৃষ্ণা, আবার জেগেছে কোনো নতুন তৃষ্ণা।

সাধুদের কাছ থেকে সিদ্ধার্থ শিখেছে অনেক। নিজেকে লোপ করে দেবার অনেক উপায় জেনে নিয়েছে। বেদনা দিয়ে আত্মাকে পীড়ন করেছে; পীড়ন করেছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দিয়ে। স্বেচ্ছায় ক্লেশ বরণ করেছে, শিখেছে বেদনা জয় করতে। আবার ধ্যানের পথে সত্তা লোপের চেষ্টা করেছে, মনের আকাশ থেকে সকল ছবি মুছে নিয়ে শূন্যতায় পূর্ণ করতে চেয়েছে মনকে। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমনি কত পথ সে অবলম্বন করেছে। হাজারো বার সিদ্ধার্থ আপন সত্তাকে

হারিয়েছে, দিনের পর দিন আত্মগোপন করেছে অবিদ্যমানতায়। তবু কি আশ্চর্য, যদিও এসব প্রক্রিয়া তাকে দূরে নিয়ে গেছে তার সত্তাকেন্দ্র থেকে তথাপি শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হয়েছে সেই নিজের মধ্যেই। যদিও সহস্রবার সিদ্ধার্থ আপন সত্তার কাছ থেকে পালিয়েছে, হারিয়ে গেছে অবিদ্যমানতায়, বাস করেছে জন্তু ও পাথরের মধ্যে, তবু তার নিজের মধ্যে ফিরে আসাটা অবশ্যম্ভাবী। সূর্যালোকে কিংবা চন্দ্রালোকে, ছায়ায় বা বৃষ্টিতে,—কোন এক মুহূর্তে আবার ফিরে আসবেই, জীবনচক্রের দুর্বহ যাতনা আবার জাগিয়ে তুলবে সিদ্ধার্থের নিজস্ব সত্তা।

গোবিন্দ ছায়ার মতো পাশে পাশে থাকে। সে-ও সিদ্ধার্থের পথে সাধনার চেষ্টা করে। যতটুকু বাক্যালাপ অত্যাবশ্যক তা ছাড়া তারা কথা বলত না। কখনো কখনো দুজনে গ্রামে যেত নিজেদের ও আচার্যদের জন্য ভিক্ষা করতে।

একদিন ভিক্ষায় বেরিয়ে সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করল, "গোবিন্দ, তোমার কি মনে হয়? আমরা কি একটুও এগিয়ে যেতে পেরেছি? লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছি কি?"

গোবিন্দ বলল, "আমরা শিখেছি অনেক, এখনও শিখছি। তুমি একজন মস্ত বড় তপস্বী হবে, সিদ্ধার্থ। প্রত্যেক পাঠই তুমি শীগ্‌গীর করে শিখে নিয়েছ। সাধুরা প্রায়ই তোমার গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। সিদ্ধার্থ, তুমি ঋষিত্ব লাভ করবে।"

সিদ্ধার্থ বলল, "না বন্ধু, আমার তা মনে হয় না। এ পর্যন্ত আমি সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যা শিখেছি তা আরো সহজে এবং দ্রুত শিখতে পারতাম যে কোনো পান্থশালায়, গণিকালয়ে, মুটে-মজুর ও পাশা খেলোয়াড়দের সাহচর্যে।"

গোবিন্দ বলল, "তুমি তামাসা করছ। ও সব হতভাগাদের কাছ থেকে তপস্যা ও প্রাণায়াম কি করে শিখতে? ক্ষুধা ও বেদনার অনুভূতিহীনতা জানা কি সম্ভব হতো ওদের কাছ থেকে?"

সিদ্ধার্থ মৃদু কণ্ঠে স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগল, "তপস্যা কি? দেহকে ত্যাগ করবার অর্থ কি? উপবাস কিংবা প্রাণায়ামে কি হয়? এগুলো শুধু নিজের কাছ থেকে পালাবার উপায়, অহংএর যাতনা থেকে সাময়িক পলায়ন। এরা জীবনের পাপ ও বেদনার বিরুদ্ধে ক্ষণস্থায়ী উপশামক। এমনি করেই গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান জীবন থেকে পলায়নের জন্য কয়েক পাত্র ধেনো মদ পান করে। তখন সে আর অহংকে অনুভব করে না, ভুলে যায় জীবনের বেদনা। সুরা এনে দেয় সাময়িক পরিত্রাণ। সিদ্ধার্থ ও গোবিন্দ দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার দ্বারা দেহের বন্ধন থেকে যে সাময়িক পরিত্রাণ লাভ করে, গাড়োয়ান ধেনো মদের হাঁড়ির উপর ঘুমিয়ে পড়ে ঠিক সেই অনুভূতি পায়।"

গোবিন্দ বলল, "বন্ধু, একথা বললেও তুমি জান যে সিদ্ধার্থ

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান নয়, এবং সাধুরাও মাতাল নয়। সুরার প্রভাবে কিছুক্ষণের জন্য জীবনকে এড়ানো যেতে পারে, হয়তো সত্যি সাময়িক বিরাম ও বিশ্রাম লাভ করা সম্ভব, কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে আসতে হয় দৈনন্দিন জীবনের অপরিবর্তনীয় পৃথিবীতে। এ উপায়ে জ্ঞান বাড়ে না, নতুন বিদ্যা শেখা হয় না, জীবনের সিঁড়ি বেয়ে এক ধাপ উপরে ওঠাও সম্ভব নয়।"

একটু হেসে সিদ্ধার্থ বলল, "আমি জানি না। কোনোদিন তো মদ খাইনি। কিন্তু আমি--এই সিদ্ধার্থ- যে তপস্যা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের দ্বারা শুধু ক্ষণকালের পরিত্রাণ পাই জীবন থেকে, জ্ঞান ও মোক্ষ যে গর্ভস্থ ভ্রূণের মতোই আমার কাছে দূরের বস্তু, একথা আমি জানি, গোবিন্দ।"

আর একবার ভিক্ষায় বেরিয়ে দু'জনে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আরম্ভ করল। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, "গোবিন্দ, আমরা কি ঠিক পথে চলেছি? জ্ঞান লাভ করেছি কি আমরা? মোক্ষ লাভের দিকে এগিয়ে চলেছি কি? অথবা যে গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাবার জন্য গৃহ ত্যাগ করেছি, সেই গোলকধাঁধাতেই ঘুরে মরছি?"

গোবিন্দ আশ্বাস দিয়ে বলল, "আমরা অনেক শিখেছি, সিদ্ধার্থ। আরও কত শেখবার আছে! গোলকধাঁধা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, উঠ্‌ছি উপরের দিকে। পথ উঠেছে ঘুরে ঘুরে, এর মধ্যেই অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙেছি আমরা।"

সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করল, "আমাদের শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠ আচার্যের বয়স কত বলতে পার?"

"তাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর হবে।"

সিদ্ধার্থ বলল, "ষাট বছর বয়সেও তিনি নির্বাণ লাভ করতে পারেননি। তাঁর বয়স হবে সত্তর, সত্তর থেকে গড়িয়ে যাবে আশীতে; আমরাও তাঁর মতো বৃদ্ধ হবো, কত অনুষ্ঠান, উপবাস ও তপস্যা করব, কিন্তু আমরা নির্বাণ লাভ করব না—তিনিও না, আমরাও না। গোবিন্দ, আমার ধারণা যে সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজনও বোধ হয় নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। আমরা শুধু কতকগুলি চাতুরী শিখেছি, তা দিয়ে নিজেদের প্রতারিত করি, কখনো বা একটু সান্ত্বনা পাই, কিন্তু আসল জিনিসের সন্ধান এখনো পাইনি। বলো, যার জন্য এত আয়োজন, এত ধ্যান ধারণা, সেই পথের সন্ধান কে পেয়েছে?"

গোবিন্দ যেন বাধা দেবার জন্যই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, এমন ভয়ংকর কথা তুমি বলো না, সিদ্ধার্থ। এত পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, কঠোরব্রতী শ্রমণ, সাধু-সন্ন্যাসী এবং জিজ্ঞাসু,—যাঁরা তদ্গত চিত্তে অন্তরদেবতার সাধনা করছেন তাঁরা কেউ পথ খুঁজে পাবেন না?"

সিদ্ধার্থ বিদ্রূপ ও বেদনা মেশান কণ্ঠে উত্তর দিল, "গোবিন্দ, তোমার বন্ধু এতদিন যে পথে তোমার সঙ্গে চলেছে সে পথ শীগগীরই তাকে ত্যাগ করতে হবে। গোবিন্দ, আমার কত

জিজ্ঞাসা, তৃষ্ণার জ্বালা ; কিন্তু সন্ন্যাসীদের পথ অনুসরণ করে সে তৃষ্ণা একটুও তৃপ্ত হলো না। জ্ঞানের তৃষ্ণা সর্বদা আমাকে ব্যাকুল করে, কত অসংখ্য প্রশ্নে আমার মন সর্বদা পূর্ণ। বছরের পর বছর আমি ব্রাহ্মণদের প্রশ্ন করেছি, পবিত্র বেদের মধ্যে দিনের পর দিন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। হয়তো বনের গণ্ডার কিংবা বনমানুষকে প্রশ্ন করলেও ঠিক এমনি পুণ্যের ও বুদ্ধিমানের কাজ হতো। গোবিন্দ, এই একটি কথা জানতে আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি : সে কথাটি এই যে আমরা কিছুই শিখতে পারি না। আমার মনে হয় প্রত্যেক বস্তুর মূল সত্তায় এমন কিছু আছে যাকে জানা যায় না। আমার মধ্যে, তোমার মধ্যে, সর্ব জীবে এবং সর্বত্র পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি ; আত্মার স্বরূপ তো শেখা যায় না। আমার এখন মনে হয় এই অনুভূতির সবচেয়ে বড় শত্রু হলো পণ্ডিত এবং তাঁর পাণ্ডিত্য।”

গোবিন্দ পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। নিষেধের ভঙ্গীতে হাত তুলে বলতে লাগল, “এসব কথা বলে তোমার বন্ধুকে দুঃখ দিও না। সত্যি বলছি, তোমার কথা আমাকে বেদনা দেয়। তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, যদি বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য না থাকত, তাহ'লে ভেবে দেখ, পবিত্র আরাধনা ব্যর্থ হয়ে পড়বে, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধার মূল কারণটাও যাবে দূর হয়ে। সিদ্ধার্থ, জ্ঞান যদি সত্য না হয় তাহ'লে সংসারে

মূল্য যাচাই করব কি দিয়ে ? পৃথিবীতে পবিত্র কি, কোন্ জিনিস মূল্যবান এবং শ্রদ্ধার যোগ্য তা বাছাই করব কোন উপায়ে ?”

অনেকটা যেন নিজের বক্তব্যের সমর্থনে গোবিন্দ গুনগুন করে উপনিষদের একটি শ্লোক আবৃত্তি করল :

শুচি শুভ্র মন যার ডুবেছে আত্মায়,
সেই জানে কী আনন্দ মহামৌনতায়।

সিদ্ধার্থ অনেকক্ষণ ধরে নীরবে বিচার করল গোবিন্দের কথাগুলি। নতমস্তকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ ভাবল : হাঁা, সত্যি তো ! যা কিছু শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করি তার কি থাকে ? কি অবশিষ্ট থাকে ? কি রক্ষা পায় ? মাথা ঝাঁকল সিদ্ধার্থ।

একে একে দুই বন্ধুর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যখন প্রায় তিন বছর কেটে গেল তখন নানা জায়গায় নানা লোকের মুখ থেকে একটা জনশ্রুতি তাদের কানে আসতে লাগল : গৌতম বুদ্ধ নামে একজন মহাত্মার আবির্ভাব হয়েছে। তিনি জয় করেছেন পৃথিবীর সকল দুঃখ, এবং স্তব্ধ করে দিয়েছেন জীবন-মৃত্যুর চক্রাকার গতি। তিনি শিষ্যপরিবৃত হয়ে ধর্মোপদেশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশের সর্বত্র ; তাঁর সম্পত্তি নেই, গৃহ নেই, নেই সংসার ; পরিধানে সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোষাক। কিন্তু উন্নতললাট সেই মহাত্মার পদতলে কত রাজা, কত ব্রাহ্মণ লুটিয়ে পড়ে,—গ্রহণ করে শিষ্যত্ব।

এই জনশ্রুতি, এই কাহিনী, ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র,—শোনা যায় যেখানেই যাবে। নগরে ব্রাহ্মণরা এই কথা নিয়ে আলোচনা করে, সাধুরা করে বনে। দুই তরুণ বন্ধুর কানে অবিরাম গৌতম বুদ্ধের নাম এসে পৌঁছায়। সে নাম কখনো নিন্দায় মলিন, কখনো বা প্রশংসায় উজ্জ্বল।

কোন দেশ যখন মহামারীর আক্রমণে উৎসন্নে যাবার মুখে তখন প্রায়ই জনশ্রুতি শোনা যায় যে এমন একজন বিজ্ঞ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যাঁর নিঃশ্বাসের স্পর্শে, একটি মঙ্গলবাণীতে রোগী নিরাময় হয়। এই কাহিনী দ্রুত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, মহামারীর কালো ছায়ার নীচে এই নিয়ে সবাই আলোচনা করে; —অনেকে বিশ্বাস করে, অনেকে করে সন্দেহ। কত লোক শোনা মাত্র ছুটে যায় মহাপুরুষের সন্ধানে। ঠিক তেমনি শাকাকুলোদ্ভব গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের সুসংবাদ বেদনাক্লিষ্ট দেশের সর্বত্র প্রচারিত হলো। ভক্তরা বলে, তাঁর জ্ঞান প্রগাঢ়, তিনি জাতিস্মর, তিনি জেনেছেন নির্বাণের মন্ত্রগুপ্তি। জন্ম-মৃত্যুর বিবর্তন আর তাঁকে স্পর্শ করবে না, জন্মে জন্মে বিভিন্ন জীবের আকার গ্রহণ করতে হবে না। আকারের উত্তাল স্রোতে আর ডুব দেবার প্রয়োজন থাকবে না মৃত্যুর পরে নতুন দেহাবয়ব গ্রহণ করতে। অনেক বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনা যায় তাঁর সম্বন্ধে। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, শয়তানকে জয় করেছেন, কথা

বলেছেন স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর শত্রুরা এবং সন্দেহবাদীরা বলত গৌতম প্রতারক; বিলাসের মধ্যে তাঁর দিন কাটে, যাগ-যজ্ঞকে তিনি অবজ্ঞা করেন, বিদ্যা নেই, তপস্যার রীতি-নীতি জানা নেই, আর জানেন না দেহের কামনাকে শাসন করবার উপায়।

বুদ্ধ সম্বন্ধে জনশ্রুতির মধ্যে কি যেন আকর্ষনীয় ছিল; এই কাহিনীতে কি যাদু ছিল বুঝি! পীড়িত পৃথিবীর কঠোর জীবনে দেখা দিল নতুন আশা; শোনা গেল নতুন আশার বাণী,—যে বাণীতে আছে শান্তি ও সান্ত্বনা, আর আছে ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা। সর্বত্র সকল লোকের মুখে মুখে বুদ্ধের কথা। ভারতের সকল স্থানে তরুণরা তাঁর কথা শোনে; তাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায় নতুন আশায়, অজানা আকাঙ্ক্ষায়। কি গ্রামে, কি নগরে, সর্বত্র তীর্থযাত্রী ও বিদেশীদের সমাদরে আপ্যায়িত করা হতো যদি তাদের কাছে থাকত শাক্যমুনির কোন সংবাদ।

জনশ্রুতি এসে পৌঁছল অরণ্যচারী সন্ন্যাসীদের কানেও। সিদ্ধার্থ এবং গোবিন্দও শুনতে পায় টুকরো টুকরো খবর। প্রতিটি সংবাদ আশায় উজ্জ্বল, সন্দেহে ভারাক্রান্ত। বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী বুদ্ধ-কথা পছন্দ করেন না। সুতরাং দুই বন্ধুর একথা নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ নেই। তিনি শুনেছেন বুদ্ধ প্রথম সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনবাসী হয়েছিলেন; ফিরে এসে

মগ্ন হয়েছেন বিলাসে ; যে গৌতমের জীবনের ইতিহাস এই, তাঁর কথা শোনবার আগ্রহ নেই সন্ন্যাসীর।

একদিন গোবিন্দ সিদ্ধার্থকে বলল, "আজ আমি গ্রামে গিয়েছিলাম ; এক ব্রাহ্মণ আমাকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর গৃহে। সেই বাড়ীতে দেখা হলো এক ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে। সে এসেছে মগধ থেকে, নিজের চোখে দেখেছে বুদ্ধকে, শুনেছে তাঁর উপদেশ। আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল, ভাবলাম, আমরাও যদি যেতে পারতাম তাঁর কাছে! সিদ্ধার্থ, চলো আমরাও শুনে আসি বুদ্ধের উপদেশ।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "আমি তো ভেবেছি গোবিন্দ চিরদিনই সাধুদের সঙ্গে থাকবে। সাধুর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা সে অভ্যাস করে যাবে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। কিন্তু গোবিন্দকে আমি কতটুকু জানতাম! কতটুকু জানতাম তার হৃদয়ের কথা! এখন দেখছি তুমি নতুন পথ গ্রহণ করতে চাও, যেতে চাও বুদ্ধের উপদেশ শুনতে।"

গোবিন্দ বলল, "আমাকে বিদ্রূপ করে তুমি কৌতুক অনুভব করতে চাও, করো ; তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু সিদ্ধার্থ, তাঁর উপদেশ শোনবার জন্য তোমারও কি আগ্রহ হয় না? সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে বেশি দিন থাকবে না, একথা তো তুমিও বলেছ আমাকে।"

সিদ্ধার্থ হেসে উঠল। সে হাসিতে মেশান ছিল বিদ্রূপ ও

বেদনার প্রচ্ছন্ন সুর। বলল, "বেশ বলেছ, গোবিন্দ ; তুমি তো দেখছি আমার কথাগুলি বেশ মনে করে রেখেছ ; আশা করি আর যা বলেছিলাম তা-ও ভুলে যাওনি। আমি বলেছিলাম, বিদ্যা এবং উপদেশে আস্থা হারিয়ে ফেলেছি, গুরুবাক্যে আর বিশ্বাস নেই। যা-ই হোক, নতুন উপদেশ শুনতে যাবার জন্য আমিও প্রস্তুত। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই নতুন শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফলের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচয় হয়েছে।"

গোবিন্দ উত্তর দিল, "তোমার সম্মতি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু গৌতমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্বেই তাঁর শিক্ষার পরিচয় কি করে আমরা পেয়েছি তা বুঝিয়ে বলো।"

সিদ্ধার্থ বলল, "গোবিন্দ, গৌতমের শিক্ষার যে ফল পেয়েছি আগে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাক। তাঁর উপদেশ আমাদের প্রলুব্ধ করে' শ্রমণদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে ভালো অন্য কি ফল পাওয়া যাবে তার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।"

সেদিনই সিদ্ধার্থ বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে তাদের চলে যাবার সিদ্ধান্ত জানাতে গেল। নবীন শিক্ষার্থীসুলভ বিনয় ও সৌজন্যের সঙ্গে কথা বলল সিদ্ধার্থ ; কিন্তু বৃদ্ধ দু'জনে চলে যাবে শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন তাদের।

গোবিন্দ একটু ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু তার কানে চুপি চুপি সিদ্ধার্থ বলল, "এই বৃদ্ধের কাছে যে কিছু শিখেছি, আজ তার একটু পরিচয় দিয়ে যাব।"

সিদ্ধার্থ একাগ্র মনে গিয়ে দাঁড়াল সন্ন্যাসীর সামনে ; তাঁর চোখে চোখ নিবদ্ধ করে স্থির দৃষ্টি দিয়ে বন্দী করে ফেলল বৃদ্ধকে। সন্ন্যাসী সম্মোহিত হয়ে পড়লেন, তাঁর ইচ্ছা লোপ পেল, কথা হারিয়ে গেল। সিদ্ধার্থ তাঁকে নির্দেশ দিল নীরবে আদেশ পালন করতে। বৃদ্ধের মুখে কথা নেই, চোখ কাচের মতো চক্ চক্ করছে, দেহ গেছে অসাড় হয়ে ; তাঁর দুই বাহু ঝুলে পড়েছে ; সিদ্ধার্থের যাদু তাঁকে শক্তিহীন করেছে। সিদ্ধার্থ জয় করেছে সাধুর চিন্তা ; তার আদেশ পালন না করে উপায় নেই। বৃদ্ধ কয়েকবার অভিবাদন করে আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন এবং থেমে থেমে জানালেন শুভযাত্রার কামনা। দুই বন্ধু আশীর্বাদের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে, প্রত্যভিবাদন করে, পথে বেরিয়ে পড়ল।

পথ চলতে চলতে গোবিন্দ বলল, "সিদ্ধার্থ, আমার যা ধারণা ছিল সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে তুমি তার চেয়ে অনেক বেশী শিখে নিয়েছ। একজন বৃদ্ধ সাধুকে এভাবে সম্মোহিত করতে পারা সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমার মনে হয়, এখানে থাকলে তুমি নিশ্চয়ই জলের উপর দিয়ে হাঁটবার কৌশল শীগ্গীর শিখতে পারতে।"

"জলের উপর হাঁটবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই।" সিদ্ধার্থ উত্তর দিল। "এসব চাতুরী নিয়ে বুড়ো সধুরাই সন্তুষ্ট থাক।"

গৌতম

শ্রাবস্তীপুরীর প্রত্যেক শিশুও বুদ্ধের নামের সঙ্গে পরিচিত। গৌতমের ভিক্ষার্থী শিষ্য নীরবে যে বাড়ীর সামনেই এসে দাঁড়াক, ভিক্ষাপাত্র তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়ে যায়। নগরের নিকট-বর্তী জেতাবন উদ্যানে বুদ্ধের প্রিয় বাসস্থান। বুদ্ধের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ধনী বণিক অনাথপিণ্ডদ এই জেতাবন গৌতম ও তাঁর শিষ্যদের ব্যবহারেব জন্য উৎসর্গ করেছেন।

গৌতমের অনুসন্ধান কবতে করতে তুই বন্ধু এসে পৌঁছল শ্রাবস্তীপুরীতে। কত লোককে প্রশ্ন করে, জন-শ্রুতি শুনে শুনে তারা পথ চলেছে। শ্রাবস্তীর যে বাড়ীর সামনে তারা প্রথম এসে ভিক্ষাব জন্য দাঁড়াল মুখ ফুটে কিছু বলবার আগেই সে বাড়ীর কর্ত্রী তাদের খাবার এনে দিলেন। আহার শেষ করে সিদ্ধার্থ কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, "ভদ্রে, বুদ্ধের ঠিকানা যদি দয়া করে আমাদের বলে দেন তাহ'লে বিশেষ উপকৃত হব। তাঁকে দর্শন করব এবং তাঁর নিজের মুখ থেকে উপদেশ শুনব বলে আমরা দু'জন তপস্বী বন থেকে এসেছি।"

মহিলা বললেন, "হে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী, আপনারা যথাস্থানেই এসেছেন। বুদ্ধদেব এখন কিছুদিনের জন্য বাস করছেন অনাথপিণ্ডদের উদ্যান জেতাবনে। প্রকাণ্ড উদ্যানে দেশ দেশান্তর থেকে আগত বুদ্ধের উপদেশ শোনবার অভিলাষী হাজার হাজার লোকের আশ্রয় পাবার মতো যথেষ্ট স্থান আছে। আপনারাও আজকের রাতটা সেখানে অতিবাহিত করুন।"

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল গোবিন্দ: বলল, "বাঃ, তাহ'লে তো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছি আমরা: আমাদের ভ্রমণ এবার শেষ হলো। কিন্তু ভদ্রে, বলুন তো আপনি বুদ্ধকে দেখেছেন? দেখেছেন তাঁকে নিজের চোখে?"

মহিলা উত্তর দিলেন, "অনেকবার দেখেছি তাঁকে। কতদিন তাঁকে রাস্তা দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যেতে দেখেছি; পরনে গেরুয়া বসন, নীরবে ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে দিয়েছেন দুয়ারে দুয়ারে, তারপর পূর্ণ পাত্র নিয়ে ফিরে গেছেন জেতাবনে।"

গোবিন্দ মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল বুদ্ধের কথা। আরো প্রশ্ন করে তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু শোনবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ স্মরণ করিয়ে দিল এবার যাবার সময় হয়েছে; দু'জনে কর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করল।

পথ জেনে নেবার প্রয়োজন নেই। পথ বেয়ে চলেছে কত পর্যটক; বৌদ্ধ ভিক্ষুও আছে তাদের মধ্যে। সকলের

লক্ষ্য জেতাবন। সিদ্ধার্থ ও গোবিন্দ সেই জনস্রোতে মিশে গেল। রাত্রিতে তারা যখন জেতাবনে পৌঁছল তখনও অবিরাম আসছে অতিথির দল। সেই সমবেত বিপুল জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আশ্রয়ের প্রার্থনা এবং আশ্রয় লাভ করে ধন্যবাদ। দুই বন্ধুও আশ্রয় পেল সহজেই; বনবাসে তারা অভ্যস্ত, তাদের কোনো অসুবিধাই হলো না।

রাত্রি প্রভাত হলো। সিদ্ধার্থ ও গোবিন্দ বিস্মিত হয়ে গেল উদ্যানের চারদিকে চেয়ে। কী বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সেখানে রাত কাটিয়েছে! সেই চমৎকার উদ্যানের পথে পথে গেরুয়াধারী ভিক্ষুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে সেখানে গাছের নীচে কেউ বা ধ্যানে মগ্ন, আবার কয়েকজন হয়তো দল বেঁধে আধ্যাত্মিক আলোচনায় মত্ত। সেই ছায়াময় উদ্যান যেন একটি অভিনব নগর, যার নাগরিক কয়েক ঝাঁক মৌমাছি। অধিকাংশ ভিক্ষুরাই একে একে ভিক্ষা পাত্র হাতে করে উদ্যান ত্যাগ করল, দ্বিপ্রহরের খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে—সারাদিনে ঐ একবার মাত্র আহার। বুদ্ধ নিজেও প্রাতঃকালে ভিক্ষায় বের হতেন।

সিদ্ধার্থ দেখতে পেল তাঁকে, আর তৎক্ষণাৎ চিনতে পারল,—যেন কোনো এক দেবতা চিনিয়ে দিলেন। দেখল, বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে করে ধীরে ধীরে উদ্যান ত্যাগ করছেন; তাঁর পরিধানে গেরুয়া বসন; মুখে নিরহঙ্কার, বিনয়নম্র প্রশান্তি।

গোবিন্দের কানে কানে বলল সিদ্ধার্থ, "দেখ, ঐ যে বুদ্ধ যাচ্ছেন !"

গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগল গোবিন্দ। শত শত ভিক্ষুর মধ্য থেকে আলাদা করা যেতে পারে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য সহসা তাঁর মধ্যে দেখা যায় না ; তবু অবিলম্বে চিনতে পারল গোবিন্দ ; হাঁ, এই বুদ্ধ ; দুই বন্ধু তাঁর উপর• চোখ রেখে পশ্চাদানুসরণ করতে লাগল।

চিন্তামগ্ন চিত্তে বৃদ্ধ ধীরভাবে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর শান্ত মুখমণ্ডলে ছিল না সুখ কিংবা দুঃখের রেখা। তাঁর অন্তরে বুঝি একটি মৃদু হাসির উৎস আছে। এই গোপন হাসির উৎস নিয়ে তিনি নীরবে প্রশান্ত মনে হেঁটে চলেছেন। অন্যান্য ভিক্ষুদের মতোই তিনি গেরুয়া বসন পরিধান করে ভিক্ষায় বেরিয়েছেন, কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল এবং পাদক্ষেপ, শান্ত নত দৃষ্টি, ঝুলে পড়া দুই বাহু এবং হাতের প্রতিটি আঙ্গুল যেন শান্তির বানী ঘোষণা করছে, বলছে পূর্ণতা ও অনাসক্তির কথা, যেন প্রতিফলিত হচ্ছে এক অব্যাহত, অখণ্ড শান্তি,—একটি অপরিম্লান জ্যোতির শিখা।

গৌতম ভিক্ষাপাত্র হাতে করে নগরের পথে পথে ঘুরছেন। দুই নবীন সন্ন্যাসী মুগ্ধ হয়েছে তাঁর শান্ত আচরণ দেখে, তাঁর অচঞ্চল দেহের লাবণ্যে,—যে দেহে আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, কপটতা

বা উত্তমের চিহ্ন নেই ; আছে শুধু অপূর্ব জ্যোতি ও মনোরম প্রশান্তি।

অনেকটা আপন মনেই বলল গোবিন্দ, "আজ তথাগতের মুখ থেকে উপদেশ শুনতে পাব।"

সিদ্ধার্থ কিছুই বলল না। উপদেশ সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতূহল নেই। উপদেশ থেকে নতুন কিছু শিখবে এমন আশা সে করে না। সরাসরি না হলেও অন্য লোকের মুখ থেকে তারা জেনেছে বুদ্ধের উপদেশের সারমর্ম। গোবিন্দ গভীর আগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে বুদ্ধের মাথায়, কাঁধে ও ঝুলে-পড়া স্থির বাহুর উপরে। তাঁর হাতের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের প্রতিটি সন্ধি থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে বাঙ্ময়, জীবন্ত জ্ঞান ; সেই জ্ঞান থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে সত্যের দীপ্তি। এই লোকটি, এই বুদ্ধ, প্রকৃতই ধার্মিক ; কোনো ফাঁকি নেই। সিদ্ধার্থ এত শ্রদ্ধা কখনো কাউকে করেনি, এমন করে কাউকে আর ভালোবাসেনি।

দুই বন্ধু নীরবে বুদ্ধের সঙ্গে নগর পরিক্রম করে তাঁর পিছু পিছু ফিরে এল জেতাবনে। বুদ্ধ উদ্যানে ফিরে এসে শিষ্য পরিবৃত হয়ে খেতে বসলেন ; আহার্যের পরিমাণ দেখে বিস্মিত হয়ে গেল সিদ্ধার্থ। একটা পাখীকেও এর চেয়ে বেশি খেতে হয়। খাওয়া শেষ হবার পর বুদ্ধ আম গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন।

বিকেল বেলা ; দিনের উত্তাপ হ্রাস পেয়েছে। আশ্রমের সবাই এসে মিলিত হল উপদেশ শুনতে। গোবিন্দ ও সিদ্ধার্থ

এই প্রথম সুযোগ পেল বুদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনবার। নিটোল, পরিপূর্ণ স্বর ; শান্ত এবং শান্তির প্রলেপ মাখানো। গৌতম বললেন দুঃখ সম্বন্ধে ; দুঃখের কারণ এবং তার হাত থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করলেন। জীবন শুধু বেদনা, সংসার দুঃখে পূর্ণ ; কিন্তু দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় পাওয়া গেছে। মুক্তি পাওয়া যাবে বুদ্ধের পথ অনুসরণ করলে।

মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বুদ্ধ ধর্ম্মচক্র শিক্ষা দিলেন, ব্যাখ্যা করলেন আষ্টাঙ্গিক আর্যমার্গের। উদাহরণের সাহায্যে এবং এক বিষয় বার বার বলে বক্তব্য স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। বার বার বলতে তাঁর ক্লান্তি নেই ; এভাবে উপদেশ দেওয়াই তাঁর অভ্যাস। তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে স্পষ্টরূপে পৌঁছে দিল উপদেশ—পৌঁছে দিল আলোকরশ্মির মত, আকাশে নক্ষত্রের মতো।

বুদ্ধের আলোচনা শেষ হতে রাত্রি হয়ে গেল। শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে অনেকে এলো এগিয়ে, অনুরোধ করলো তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করে নিতে। বুদ্ধ তাদের গ্রহণ করলেন ; বললেন, "তোমরা বেশ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেছ ; আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দুঃখকে জয় করো, যাত্রা শুরু করো চরম আনন্দের পথে।"

লাজুক গোবিন্দ সামনে সরে এলো। বলল, "আমিও ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই।" তার

আবেদন গৃহীত হলো ; আনন্দে ভরে উঠল গোবিন্দের বুক।

রাত্রির বিশ্রামের জন্য বুদ্ধ চলে যাওয়া মাত্র গোবিন্দ সিদ্ধার্থের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ; ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, "সিদ্ধার্থ, তোমাকে তিরস্কার করা আমার শোভা পায় না। আমরা দুজনেই তাঁর উপদেশ শুনেছি, আমি দীক্ষা নিয়েছি এই নবধর্মের। কিন্তু, বন্ধু, তুমিও কি আসবে না মুক্তির পথে ? তুমি কি বিলম্ব করবে, এখনো অপেক্ষা করে থাকবে ?"

সিদ্ধার্থ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। অনেক ক্ষণ চেয়ে রইল গোবিন্দর মুখের উপর। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "গোবিন্দ, বন্ধু, তুমি নতুন পথে পা দিয়েছ, বেছে নিয়েছ তোমার পথ। তুমি আমার আজন্মের বন্ধু, তবু চিরদিন চলেছ আমার পিছে পিছে। কতবার আমি ভেবেছি আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে গোবিন্দ আমাকে ছাড়া একা পথ চলতে শিখবে কবে ? এইতো দেখছি, এখন তুমি সাবালক হয়েছ এবং নিজের পথ খুঁজে নিয়েছ। এই পথের শেষ পর্যন্ত দেখবে বলে আশা করি। তুমি মোক্ষ লাভ করো,—এই আমার কামনা।"

গোবিন্দ যেন সিদ্ধার্থের কথার মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে অধৈর্য হয়ে পূর্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল : "বুদ্ধ-

দেবের আনুগত্য স্বীকার না করে উপায় নেই, সে কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই ; বলো !"

গোবিন্দের কাঁধে হাত রেখে সিদ্ধার্থ বলল, "তুমি তো আমার শুভকামনা শুনেছ। আবার বলছি। নতুন পথের শেষ পর্যন্ত যেন যেতে পার ; যেন মোক্ষলাভ করতে পার !" গোবিন্দ হঠাৎ বুঝতে পারল বন্ধু তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। তার সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "সিদ্ধার্থ !"

সিদ্ধার্থ বড় মমতার সঙ্গে ধীরে ধীরে বলল, "গোবিন্দ, ভুলে যেও না তুমি এখন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একজন। তুমি গৃহ ত্যাগ করেছ, পিতা-মাতাকে ছেড়ে এসেছ ; বংশপরিচয় ও সম্পত্তি, জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও বন্ধুত্ব—সব কিছু তুমি ত্যাগ করেছ। তথাগতের তো তাই উপদেশ। তুমিও এই চেয়েছ এতদিন। গোবিন্দ, কাল সকালে আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব।"

অনেক ক্ষণ ধরে দুই বন্ধু উদ্যানে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। তারপর তারা শুয়ে পড়ল, কিন্তু কারো চোখেই ঘুম এলো না। গোবিন্দ বন্ধুর কাছ থেকে বার বার জানতে চাইল সে কেন বুদ্ধের অনুগামী হবে না, তাঁর শিক্ষায় কি ত্রুটি দেখতে পেয়েছে। কিন্তু পীড়াপীড়িতে ফল হলো না। সিদ্ধার্থ শুধু একটি উত্তরই দেয় : "তুমি নিশ্চিন্ত হও, গোবিন্দ ! তথা-

গতের শিক্ষা অতি উত্তম। তার ত্রুটি আমি কি করে বের করব ?"

পরদিন প্রত্যূষে একজন বৃদ্ধ ভিক্ষু উদ্যানে ঘুরে ঘুরে নবদীক্ষিতদের আহ্বান করলেন তাঁর কাছে। তাদের হাতে তুলে দিলেন বৌদ্ধ শ্রমণের গৈরিক বস্ত্র এবং শিখিয়ে দিলেন বুদ্ধ শিষ্যের কর্তব্য। গোবিন্দ আশৈশব বন্ধুকে শেষ বারের মতো আলিঙ্গন করল, সিদ্ধার্থের স্পর্শ থেকে নিজেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এলো ; তারপর নতুন গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে যেন আরো দূরে সরে গেল।

সিদ্ধার্থ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে গৌতমের সামনে এসে পড়ল। কি প্রশান্তি, কি করুণা বুদ্ধের মুখমণ্ডলে ! মুগ্ধ হলো সিদ্ধার্থ। ভক্তিভরে প্রণাম করে অনুমতি চাইল তাঁর সঙ্গে কয়েকটি কথা বলবার। বুদ্ধ নীরবে সম্মতি জানালেন।

সিদ্ধার্থ বলল, "কাল আপনার আশ্চর্য উপদেশ শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। অনেক দূর থেকে আমরা তুই বন্ধু আপনার উপদেশ শুনতে এসেছিলাম ; বন্ধু আপনার শিষ্যত্ব বরণ করেছে, এখানেই থেকে যাবে। আমি আবার যাত্রা করব নতুন কোনো তীর্থের পথে।"

মধুর কণ্ঠে বুদ্ধ বললেন, "যেমন তোমার অভিরুচি।"

সিদ্ধার্থ আবার বলল, "হয়তো এটা আমার ধৃষ্টতা, তবু মনে

যে প্রশ্নগুলি জেগেছে তাদের আপনাকে না জানিয়ে যেতে পারছি না। দয়া করে আর একটু শুনবেন আমার কথা ?"

বৃদ্ধ পূর্বের মতো নীরবে শির সঞ্চালন দ্বারা সম্মতি জানালেন।

সিদ্ধার্থ বলতে লাগল, "হে মহাভাগ, আপনার উপদেশ আমাকে প্রধানতঃ মুগ্ধ করে একটি কারণে। আপনি যা কিছু বলেন সব সম্পূর্ণ স্পষ্ট, প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত। আপনি দেখিয়েছেন যে এই জগৎ একটি কার্য-কারণের অনন্ত শৃঙ্খল ; এই শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ,—কোথাও ফাঁক নেই। এমন সুন্দর করে আর কেউ এ কথাটি ব্যাখ্যা করতে পারেনি ; এমন অকাট্য প্রমাণও আর কেউ দিতে পারেনি। আপনার শিক্ষার আলো দিয়ে ব্রাহ্মণরা যখন জগৎকে নতুন করে দেখবে তখন নিশ্চয়ই তাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হবে। তারা বুঝবে জগৎ আকস্মিকতার কিংবা দেবতাদের করুণার উপর নির্ভরশীল নয় ; জগতের সকল ঘটনাই পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, সেই সম্বন্ধে কোনো ছিদ্র নেই ; আর নেই অস্পষ্টতা—সব স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। জীবন শুধুই আনন্দ অথবা বেদনা, নিত্য কি অনিত্য, শুভ কিংবা অশুভ—এসব প্রশ্ন আপনার শিক্ষায় প্রাধান্য লাভ করেনি। হে দেবর্ষি, আপনার মহান উপদেশে বড় করে দেখানো হয়েছে জগতের ঐক্যবোধকে। জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা পরস্পরের সহিত সম্পর্কান্বিত, কেউ বিচ্ছিন্ন নয়,

সকলের মূলে আছে এক আদি কারণ। জীবন ও মৃত্যু এবং ছোট বড় প্রত্যেকটি ঘটনা নিয়ে প্রবহমান নদীর মতো বয়ে চলেছে এই জগৎ; কোনো কিছুরই পৃথক সত্তা নেই, সব এক ও অভিন্ন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই অখণ্ড রূপ আপনার কাছ থেকে যেমন স্পষ্ট উপলব্ধি করেছি, এমন আর কোথাও পাইনি। কিন্তু এক জায়গায় এই অখণ্ডতার আদর্শ ব্যাহত হয়েছে। একটি ছোট ছিদ্র দিয়ে যেন ঐক্যানুভূতির জগতে প্রবেশ করল এমন কিছু যার প্রমাণ নেই, যা সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরিচিত। সংসারের ঊর্ধ্বে ওঠবার এবং নির্বাণ লাভ সম্বন্ধে আপনার মতবাদ আকস্মিক এবং খাপছাড়া মনে হয়। এই ছোট ফাঁকটুকুর জন্য আপনার অখণ্ড জগতের আদর্শ ভেঙে পড়েছে; অখণ্ড জগতের চিরন্তন বিধিটাও আর একবার ভেঙে পড়ল। বিরুদ্ধ সমালোচনা করছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।"

গৌতম স্থির হয়ে নীরবে শুনলেন সিদ্ধার্থের কথা। তারপর প্রসন্ন কণ্ঠে স্পষ্ট করে বললেন, "হে ব্রাহ্মণকুমার, তুমি আমার উপদেশ ভালো করেই শুনেছ। যে গভীর অভিনিবেশ সহকারে তুমি চিন্তা করেছ তা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। তুমি একটা ত্রুটি পেয়েছ। আর একবার উত্তমরূপে ভেবে দেখো। তোমার মতো জ্ঞানপিপাসুদের আমি কথার হেঁয়ালী এবং অসংখ্য মতবাদের আগাছা থেকে সাবধান করে দিতে চাই। আমাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই; তারা হয়তো সুন্দর বা কুৎসিত;

চাতুর্যপূর্ণ অথবা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক হতে পারে ; যে কোনো মতকে গ্রহণ বা ত্যাগ করা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপর। যে উপদেশ তুমি শুনেছ তা আমার একটা মত মাত্র নয় ; জ্ঞানলিপ্সুদের নিকট জগৎকে ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যও আমার নয়। আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ; দুঃখের হাত থেকে মুক্তি-পাবার পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করাই আমার লক্ষ্য। গৌতম তা-ই শিক্ষা দেয়, অন্য কিছু নয়।"

তরুণ সন্ন্যাসী বলল, "হে মহাত্মন, আমার উপর রুষ্ট হবেন না। আপনার উপদেশ নিয়ে তর্ক করতে আমি আসিনি। আপনি যথার্থ বলেছেন মতামতের মূল্য নেই। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে। আপনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মনে মুহূর্তের জন্যও সংশয় দেখা দেয়নি। মুহূর্তের জন্যও আমার সন্দেহ হয়নি যে আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন এবং লক্ষ্যের সেই উচ্চ-শিখরে উঠেছেন যেখানে পেঁছিবার জন্য হাজার হাজার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণতনয় সাধনা করছে। নিজে পথ খুঁজে খুঁজে আপনি লক্ষ্যে পেঁছেছেন ; আপনি নিজের মতো করে চিন্তা ও ধ্যান করেছেন ; তারপর স্বোপার্জিত জ্ঞানের আলোকে সহসা একদিন পথের রেখা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। উপদেশ থেকে আপনি কিছু শিক্ষা লাভ করেননি ; এবং হে মহাভিক্ষু, আমার মনে হয়, অপরের উপদেশের সাহায্যে কেউ মোক্ষ লাভ করতে পারে না। হে মহাভাগ, বুদ্ধত্ব লাভের সেই চরম মুহূর্তে আপনার অন্তরে

কি ঘটেছিল তা বাক্যে কিংবা উপদেশের সাহায্যে অন্যকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। আপনার উপদেশে অনেক কথা বলা হয়; অসৎ পথ ত্যাগ করে কিভাবে সৎপথে চলতে হবে সে শিক্ষাও পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মুমুক্ষুর মধ্যে একমাত্র মহাত্মা বুদ্ধ স্বয়ং কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তার পরিচয় উপদেশের মধ্যে পাওয়া যাবে না। আপনার উপদেশ শোনবার পর থেকে এই কথা উপলব্ধি করেছি এবং তাই নিয়ে ভাবছি। এই জন্যই আমি আবার যাত্রা সুরু করব; এর চেয়ে ভালো শিক্ষার অনু-সন্ধানে যাচ্ছি না, কারণ জানি, এর চেয়ে ভালো উপদেশ নেই। সকল গুরু এবং তাদের শিক্ষা ত্যাগ করে নিজের পথ ধরে একাকী লক্ষ্যে পৌঁছব, অথবা প্রাণ দেব—এই সংকল্প নিয়ে আবার পথ চলব। কিন্তু আজকের দিনটির কথা প্রায়ই আমার মনে পড়বে; মনে পড়বে এই মুহূর্তটির কথা, যখন মহাপুরুষ দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।”

বুদ্ধের চোখ মাটির উপর নিবদ্ধ; সমুদ্রের মতো অতলস্পর্শ তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে গভীর প্রশান্তি। মৃদু কণ্ঠে তিনি বললেন, “আমি আশা করি তোমার যুক্তিতে ভুল নেই। তুমি সিদ্ধি লাভ কর, এই কামনা করি। কিন্তু তুমি তো দেখেছ, কত ধর্মজিজ্ঞাসুর ভীড় হয় আমার চারপাশে এবং তাদের মধ্যে কত লোক আমার শিক্ষা স্বীকার করে নিয়েছে। হে বিদেশী সন্ন্যাসী, তুমি কি মনে কর তারা যদি আমার শিক্ষা ত্যাগ করে

ফিরে যায় সংসারের কামনা-বাসনার মধ্যে, তাহ'লেই তাদের মঙ্গল হবে ?"

—"সে কথা একবারও আমার মনে হয়নি," তাড়াতাড়ি বলে উঠল সিদ্ধার্থ। "তারা সকলে আপনার শিক্ষা অবলম্বন করে সিদ্ধিলাভ করুক ! অন্যের জীবন সম্বন্ধে বিচার করবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমার জীবনের বিচার আমি নিজে করতে চাই। পথ গ্রহণ এবং বর্জন করবার অধিকার আমারই থাকবে। আমরা যারা ঘর ছেড়েছি তারা মুক্তি চাই অহং থেকে। আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে যে মুক্তি পেতাম তা হতো বাহ্যিক ; মুক্তির প্রতারণা দিয়ে নিজের মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করতাম, যদিও প্রকৃতপক্ষে আপনার শিক্ষায় নতুন রূপ পেয়ে অহং নব বলে বলীয়ান হয়ে বেঁচে উঠ্‌ত ; আপনার এবং ভিক্ষু সমাজের প্রতি আমার আনুগত্য ও ভালোবাসার মধ্যে সে পাবে বেঁচে থাকবার শক্তি।"

শান্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এবং বন্ধুত্বে কোমল মুখে আধ-ফোটা হাসি দেখা দিল। বদ্ধ স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলেন বিদেশীকে, তারপর প্রায় অলক্ষ্য এক ভঙ্গী করে বিদায়ের ইঙ্গিত জানালেন। বিদায় নেবার আগে বললেন, "হে সন্ন্যাসী, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ : চমৎকার করে কথা বলবার কৌশলও তোমার জানা আছে, বন্ধু। কিন্তু অতি বুদ্ধির হাত থেকে সাবধান !"

বুদ্ধ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন ; সিদ্ধার্থের স্মৃতির পটে চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে রইলো তাঁর স্থিরদৃষ্টি এবং আধ-ফোটা হাসি।

সিদ্ধার্থ ভাবতে লাগল এমন দৃষ্টি ও হাসি, এমন চলা ও বসা সে আর কোনো লোকেরই দেখেনি। সিদ্ধার্থের মনে হলো, আমারও আকাঙ্ক্ষা তেমনি করে হাসা, চাওয়া, বসা ও চলা ; তেমনি মুক্ত, গুণী, সংযমী, সরল এবং শিশুর মতো অথচ রহস্যময় হতে চাই আমি। কিন্তু অহংকে জয় না করতে পারলে কেউ অমন দৃষ্টি, অমন হাসি পেতে পারে না। আমি অহংকে জয় করব।

শুধু একজন লোক দেখেছি যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমার চোখ নত হয়। কত লোক দেখেছি, কিন্তু এমন লোক শুধু একজন,—আপন মনে বলল সিদ্ধার্থ। আর কারো সামনে আমার দৃষ্টি নত হবে না। এঁর ধর্মশিক্ষা আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, সুতরাং অন্য কোনো ধর্মোপদেশই পারবে না।

সিদ্ধার্থ ভাবল, বুদ্ধ আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমার সব কিছু অপহরণ করেও ফিরিয়ে দিয়েছেন তার চেয়ে মূল্যবান জিনিস। তিনি অপহরণ করেছেন আমার বন্ধুকে। গোবিন্দের আস্থা ছিল আমার উপর, এখন সে নির্ভর করে বুদ্ধের উপর। একদিন গোবিন্দ ছিল আমার ছায়া, এখন সে হয়েছে গৌতমের ছায়া। কিন্তু তিনি আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন সিদ্ধার্থকে, আমাকে।

জাগরণ

যে উদ্যানে বুদ্ধ আছেন, যেখানে গোবিন্দ রয়েছে তাঁর সঙ্গে, সেই স্থান ছেড়ে যেতে যেতে সিদ্ধার্থের মনে হলো সে যেন তার অতীত জীবনটাও রেখে এলো সেই উদ্যানে। ধীরে ধীরে পথ চলছে সিদ্ধার্থ; তার মস্তিষ্ক নানা এলোমেলো চিন্তায় পূর্ণ। গভীর ভাবে চিন্তা করতে করতে সে বিশৃঙ্খল ভাবনার মধ্যে কারণ খুঁজে পেল। যেখানে কারণ আছে চিন্তা সেখানেই সার্থক। চিন্তার সাহায্যে অনুভূতি জ্ঞানে পরিণত হয়, স্থায়িত্ব লাভ করে, আর হারিয়ে যাবার ভয় থাকে না।

পথ চলতে চলতে সিদ্ধার্থ গভীরভাবে ভাবতে লাগল। সে জানে যৌবন পার হয়ে গেছে; এখন সে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। সে উপলব্ধি করতে পারে সাপের খোলসের মতো কি যেন তাকে ত্যাগ করে গেছে। যৌবনের সেই বছরগুলিকে কি যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আজ বুঝতে পেরেছে গুরু খুঁজে বার করে তাঁর উপদেশ শোনবার জন্য সে পাগলের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু সেদিন আর নেই। বুদ্ধের মতো মহাত্মা, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ এবং পুণ্যাত্মাকেও সিদ্ধার্থ গুরু বলে স্বীকার

করতে পারল না; গ্রহণ করতে পারল না তাঁর উপদেশ। তাই সিদ্ধার্থ দূরে সরে এসেছে।

ভাবনায় ডুবে পথ চলছে সিদ্ধার্থ। প্রশ্ন করছে নিজেকে : গুরুর কাছ থেকে, তাদের উপদেশ থেকে, কি শিখতে চেয়েছিলে তুমি? হয়তো তাঁরা তোমাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু কি দিতে পারেন নি? অহংকে বুঝতে চেয়েছিলাম, জানতে চেয়েছিলাম তার ধর্ম ও প্রকৃতি। মুক্তি চেয়েছিলাম অহং থেকে, চেয়েছি তাকে জয় করতে, কিন্তু পারিনি : শুধু ব্যক্তি-সত্তাকে প্রতারণা করেছি, তার কাছ থেকে পালিয়েছি, আত্ম-গোপনের ভাণ করে মুখ ঢেকেছি। সত্যি, এই অহংকে জানবার জন্য যত ভেবেছি পৃথিবীতে আর কিছুর জন্যই তা করিনি। এই যে আমি বেঁচে আছি, সংসারে সকলের সঙ্গে এক হয়েও পৃথক ও বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে আছি, সিদ্ধার্থ নাম নিয়ে আলাদা ব্যক্তিসত্তা বজায় রেখেছি, এটাই একটা মস্ত বড় হেঁয়ালি। আমি পৃথিবীতে সব চেয়ে কম জানি নিজের বিষয়ে, সিদ্ধার্থ সম্বন্ধে।

এই চিন্তা সিদ্ধার্থকে জাপটে ধরল : তার মৃদু গতিও একেবারে থেমে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তে এই ভাবনার পথ বেয়ে এলো আর একটি নতুন ভাবনা : নিজেকে না জানবার কারণ কি? একটি কারণে সিদ্ধার্থ নিজের কাছে অচেনা বিদেশীর মতো হয়ে রয়েছে; সে কারণ হলো, আমি নিজেকেই ভয় করেছি, নিজের কাছ থেকে সারাক্ষণ পালিয়ে যেতে চেয়েছি।

আমি খুঁজেছি আত্মাকে, ব্রহ্মকে ; আত্মা, জীবন, পরমব্রহ্ম এবং অন্তরবাসী অপরিজ্ঞাত মূলাধারকে খুঁজতে গিয়ে নিজেকে ক্ষয় করেছি তিলে তিলে, অগ্রাহ্য করেছি নিজের অস্তিত্বকে। আর তা করতে গিয়ে আজ পথের মাঝখানে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।

সিদ্ধার্থ একবার আকাশের দিকে চোখ তুলল, চেয়ে দেখল চারদিকে ; মৃদু প্রসন্ন হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; দীর্ঘ স্বপ্নের পর জাগরণের প্রবল অনুভূতি যেন তার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তুলেছে। আর দ্বিধা নয় ; দ্রুত পা ফেলে সে চলতে আরম্ভ করল ; এবার লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা নেই।

না, আর সিদ্ধার্থের কাছ থেকে মুক্তি চাইব না, মনে মনে ভাবল সে। আত্মার কথা ভাবব না ; সংসারের দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে যাব। নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে সেই ধ্বংস-স্তূপ থেকে কোনো গোপন আবিষ্কার করতে চাই না। যজুর্বেদ অথর্ববেদ পড়া বন্ধ করলাম ; সন্ন্যাস ব্রতে আর আস্থা নেই, শুনব না কোনো উপদেশ। এবার থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেবে, নিজেই হবো আমার ছাত্র। সিদ্ধার্থের সকল রহস্য আমি শিখে নেব নিজের কাছ থেকে।

আবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল সিদ্ধার্থ,—যেন পৃথিবীকে এই প্রথম দেখছে। পৃথিবী কত সুন্দর ও রহস্যময়, কিন্তু সিদ্ধার্থের কাছে অপরিচিত। কত রঙের সমারোহ,—নীল,

সবুজ, হলুদ ; আকাশ ও নদী, বন ও পর্বত,—সব অপূর্ব সুন্দর, রহস্যময়, মন্ত্রমুগ্ধকর ; এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে সদ্য জাগরিত সিদ্ধার্থ পথ চলছে ; সে ফিরে যাচ্ছে নিজের কাছে। এই নীল ও হলুদ, নদী ও বন যেন আজ সিদ্ধার্থের চোখে প্রথম পড়ল। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য এখন আর মারের কুহক নয়, মায়ার ছলনা নয়, বিশ্বের অর্থহীন বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ নয় ; শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা এই বৈচিত্র্যকে অবজ্ঞা করেন, তাঁরা খোঁজেন অভিন্নতা। পরম ব্রহ্মের অভিপ্রায় অনুসারেই সৃষ্টির বিচিত্র রূপ দেখা যায় ; দেখি নদী, আকাশ ও বন ; পরম শিল্পীর ইচ্ছানুসারে এসেছে সবুজ ও হলুদ। সুতরাং বাহ্যিক বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে অভিন্ন যোগসূত্র ; এই বৈচিত্র্যের মূলে আছে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায়।

দ্রুত পা ফেলে চলছে সিদ্ধার্থ আর ভাবছে, কি নির্বোধ ছিলাম আমি! শুনেছি শুধু এক ধরণের উপদেশ ; আর কোনো কথা কানে তুলিনি, ছিলাম বধির হয়ে। কেউ যদি বই পড়তে চায়, তাহ'লে তো সে অক্ষর ও যতি চিহ্নগুলি অগ্রাহ্য করতে পারে না, বলতে পারে না এরা মায়া, এরা শুধুই অকেজো খোলস। সে সারি সারি অক্ষরগুলি সযত্নে পড়ে, তাদের ভালোবাসে, আঁকা বাঁকা কালো দাগগুলি থেকে অর্থ খুঁজে নেয়। কিন্তু আমি পৃথিবীর পুঁথি ও নিজের জীবনের পুঁথি পড়তে গিয়ে বর্ণমালা উপেক্ষা করেছি, অগ্রাহ্য করেছি সঙ্কেতচিহ্ন। এই দৃশ্যমান জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়েছি ; নিজের চোখ

ও জিহ্বাকেও বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন আমার ভুল ভেঙেছে ; জেগে উঠেছি। এবার সত্যি ঘুম ভাঙল ; আজকেই জন্ম হলো সিদ্ধার্থের।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল,—যেন পায়ের সামনে সাপ দেখেছে।

হঠাৎ এক ঝলক আলোর মতো নিজের অবস্থাটা স্পষ্ট হয়ে গেল। এইমাত্র তার ঘুম ভেঙেছে ; সদ্যোজাত শিশুর মতো সম্পূর্ণ নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হবে। সকালে জেতাবনে যখন সে জেগে উঠল, ভগবান বুদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন সে নতুন পাওয়া পথ ধরে ফিরে যাচ্ছিল নিজের কাছে, তখন তার অভিপ্রায় ছিল এতদিন সন্ন্যাসব্রতের পর গৃহে ফিরে যাবে, ফিরে যাবে পিতার কাছে। বাড়ী ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষাই তো স্বাভাবিক ! কিন্তু সাপ সামনে পড়ার মতো যখন থমকে দাঁড়াল তখন তার মনে হলো : আমি যা ছিলাম তা আর নেই ; এখন আমি সন্ন্যাসী নই, পুরুত নই, ব্রাহ্মণ নই। বাড়ী ফিরে কি করব ? আবার অধ্যয়ন আরম্ভ করব ? যাগযজ্ঞ ? অথবা তপস্যা ? এখন আমার কাছে এসব শেষ হয়ে গেছে।

সিদ্ধার্থ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; মুহূর্তের জন্য তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। সে উপলব্ধি করতে পারল পৃথিবীতে সে কত একা, কত নিঃসঙ্গ। ভীত পাখীর মতো তার বুক কেঁপে উঠল।

বছরের পর বছর গৃহহীন জীবন কেটেছে পথে পথে ; এতদিন যা অনুভব করেনি, যে অভাব মনে জাগেনি, আজ সেই অনুভূতি তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন গভীরতম ধ্যানের মধ্যেও সে ছিল তার পিতারই পুত্র, উচ্চ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব, ধার্মিক। এখন সে শুধুই সিদ্ধার্থ ; যে সিদ্ধার্থ এখন প্রবুদ্ধ, যে সিদ্ধার্থের ঘুম ভেঙেছে। এ ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই তার। সিদ্ধার্থের শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর হলো, মুহূর্তের জন্য আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। না, তার মতো নিঃসঙ্গ কেউ নেই পৃথিবীতে। সে অভিজাত সমাজের কেউ নয় ; আবার কারিগর গোষ্ঠীরও কেউ নয় যে তাদের জীবন ও ভাষা নিজের বলে গ্রহণ করবে। সে আর ব্রাহ্মণ নয়, তাই ব্রাহ্মণের জীবন গ্রহণ করতে পারে না, আর সন্ন্যাসী নয় যে তাদের সঙ্গে পথ চলবে। সংসারত্যাগী একান্তবাসী যে সন্ন্যাসী গভীর অরণ্যে বাস করে সে-ও সঙ্গীহীন নয়, একা নয় ; সে তপস্বী সমাজের একজন। তারও একটা দল আছে। গোবিন্দ ভিক্ষু হয়েছে, পেয়েছে হাজার হাজার ভিক্ষুর ভ্রাতৃত্ব। তার গৈরিক বসন মিলে যায় হাজার হাজার ভিক্ষুর গৈরিকে ; তাদের সকলের সঙ্গে এক বিশ্বাস, এক ভাষা, গোবিন্দ ভাগ করে গ্রহণ করে। কিন্তু সিদ্ধার্থ কোন দলে ? কার জীবনে সে ভাগ বসাবে ? কার ভাষা তাকে ভাষা দেবে ?

সিদ্ধার্থের চোখের সম্মুখ থেকে পৃথিবী হারিয়ে গেল ; আর কিছু নেই, সে শুধু আকাশের বুকে সঙ্গীহীন শুকতারার মতো

দাঁড়িয়ে আছে। হতাশার হিম প্রবাহ তাকে অভিভূত করে ফেলল। কিন্তু তথাপি এই মুহূর্তে সে একান্তরূপে নিজের উপর নির্ভর করে যেমন শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে এমন আর কখনো পারেনি। জাগরণের এই শেষ কম্পন, নবজন্মের এই শেষ বেদনা-বিক্ষোভ। হঠাৎ সে আবার চলতে আরম্ভ করল ; দ্রুত, অস্থির গতিতে। গৃহাভিমুখে নয়, পিতার নিকট নয়, পশ্চাতে ফিরে চাওয়া নেই ; চলছে সামনে, শুধুই সামনে।

কমলা

সিদ্ধার্থের চোখে পৃথিবীর রূপ বদলে গেছে, এতদিন যা চোখে পড়েনি তা এখন নতুন করে দেখছে। পায়ে পায়ে নতুন জিনিস চোখে পড়ে, পৃথিবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যায় সিদ্ধার্থ। পর্বত ও বনের উপর নিয়ে সূর্যোদয় হয়, আবার নদীতীরের তাল গাছের সারির পশ্চাতে ডুবে যায়। রাত্রিবেলা আকাশে তারার দল জ্বল্ জ্বল্ করে ফুটে ওঠে, কাস্তে-বাঁকা চাঁদ নৌকোর মতো নীল আকাশের উপর দিয়ে ভেসে চলে। গাছ, নক্ষত্র, পশু, মেঘ, রামধনু, পাহাড়, আগাছা, ফুল, নদী ও নদিকা, সকালবেলা পাতায় পাতায় চক্‌চকে শিশিরবিন্দু, দূরের আবছা নীল পর্বতচূড়া, ধানের ক্ষেতে বাতাসের ঢেউ,—সব যেন সিদ্ধার্থ এই নতুন দেখছে; দু'চোখ দিয়ে পান করে তাদের সৌন্দর্যসুধা। কান ভরে শোনে পাখীর গান আর মৌমাছির গুঞ্জন। বিচিত্র রঙ ও বিচিত্র আকার নিয়ে এরা সবাই আগেও ছিল, চিরদিনই আছে। অনন্ত কাল ধরে সূর্য-চন্দ্রের আকাশ-পরিক্রমা চলছে, নদী সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে এবং মৌমাছিরা গুঞ্জন করছে; পূর্বে সিদ্ধার্থের কাছে এদের কোনো মূল্য ছিল না; এরা অনিত্য,

চোখের সামনে মায়ার অবগুণ্ঠন টেনে দেয়; তাই পৃথিবীর রূপকে দেখত সন্দেহের চোখে, সচেতন মন থেকে তাদের ছেঁটে ফেলে দিয়েছিল; কারণ এরা তো সত্য নয়; সত্য আছে দৃশ্য জগতের ওপারে। কিন্তু এখন তার সতৃষ্ণ চোখ এপারে আটকে গেল; দৃশ্য জগৎকে সে চিনতে পেরেছে, পৃথিবীতে এখন তার নিজের স্থান খুঁজে নিতে চায়। প্রকৃত সত্তার সন্ধান করতে গিয়ে সে আর সময় নষ্ট করবে না; চোখের সামনে যে জগতকে দেখছে তাকে অগ্রাহ্য করে অপরিচিত, দৃশ্যাতীত কোনো এক জগতের মোহে আর ভুলবে না। শিশুর সরল চোখ দিয়ে দেখলে পৃথিবী কত সুন্দর মনে হয়। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হয়ে পৃথিবীকে বিচার করতে গেলেই সে সৌন্দর্য কর্পূরের মতো উবে যায়। চন্দ্র ও নক্ষত্র, নদিকা, নদীতীর, বন, পাহাড়, সোনালী পোকা, ফুল এবং প্রজাপতি সবই সুন্দর। নবজাত শিশুর মতো পৃথিবীর সৌন্দর্যে মগ্ন থাকায়, প্রত্যক্ষকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করায় কত আনন্দ! যা অপ্রাপ্য ও সুদূর তার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লাভ কী? কোথাও প্রখর রোদ, আবার কোনো বনের কোঁলে স্নিগ্ধ ছায়া; কোথাও কলার ছড়া আবার কোনো মাচা থেকে ঝুলছে লাউ। দিন আর রাত দ্রুত পার হয়ে যায়, পাল-তোলা আনন্দের রত্ন বোঝাই নৌকোর মতো প্রহরগুলি ছুটে পালায়। এতদিন দেখেনি, কিন্তু আজ চোখে পড়ল গম্ভীর বনে গাছের মাথায় মাথায় বাঁদরের দল

উচ্ছ্বসিত আনন্দে কিচির মিচির করে লাফালাফি করছে। পথ চলতে চলতে মেঘদম্পতির মিলনের দৃশ্য তার চোখ এড়াল না। একটু পরে দেখল পথের পাশের নল-খাগড়াপূর্ণ দীঘির জলে একটা ক্ষুধার্ত গজার মাছ শিকারের সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটছে। ছোট মাছের ঝাঁকগুলি ছুটে পালাচ্ছে প্রাণের ভয়ে। তাদের দ্রুতগতিতে আঁশগুলি ঝক্ ঝক্ করে উঠল। অনুসরণকারী লোভী মাছটা ঘাই দিয়ে দিয়ে জলে আবর্তের সৃষ্টি করেছে। দীঘির ঘূর্ণাবর্তে ফুটে উঠেছে শিকারীর বলদৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষর।

এসব তো আগেও ছিল; আছে চিরদিন। শুধু সিদ্ধার্থ ছিল না, সে চোখ মেলে কিছু দেখেনি। আজ সে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নিজের মধ্যে, সংসারের মাঝখানে। সে আজ সংসারের এক জন,—এই গাছ-পালা, পশু-পাখী, সূর্য-চন্দ্রের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। চোখ দিয়ে আলো-ছায়া দেখে, মন দিয়ে অনুভব করে চন্দ্র ও নক্ষত্রের অস্তিত্ব।

পথ চলতে চলতে সিদ্ধার্থের মনে পড়ে জেতাবনের কথা। বুদ্ধদেবের উপদেশ, গোবিন্দের সঙ্গে বিচ্ছেদ, এবং বুদ্ধের সঙ্গে আলোচনা। বুদ্ধদেবকে যে কথাগুলি সে বলেছে তার কিছুই ভোলেনি। সিদ্ধার্থ আশ্চর্য হয়ে গেল; সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝেই তখন যে কথাগুলি বলেছে এখন তাদের অর্থ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বুদ্ধদেব নিজের সাধনা দ্বারা যে প্রজ্ঞা লাভ

করেছেন তা শেখানো যায় না, সেটা তাঁরই অন্তরের গোপন ধন। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির শুভমুহূর্তে শাক্যমুনির যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না। সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করবার সঙ্কল্প নিয়েই সিদ্ধার্থ যাত্রা করেছে নতুন পথে। মনে হয়, সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে। অন্যের উপদেশ থেকে কিছু শেখা যায় না; নিজের জীবন ক্ষয় করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, অন্য কোন পথ নেই। বহুদিন থেকেই সিদ্ধার্থ জানে তার অন্তরবাসী আত্মা শাশ্বত ব্রহ্মের অংশ; কিন্তু নিজের সত্ত্বাকে সে কোনদিন প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। দার্শনিক তত্ত্বের জটিল জালে আত্মাকে বন্দী করে রেখেছিল। আত্মা কি? ব্যক্তি-সত্ত্বা কি? শুধু এই দেহ নয়, ইন্দ্রিয়ানুভূতির খেলা নয়, তত্ত্বচিন্তা নয়, বোধশক্তি নয়, অর্জিত জ্ঞান নয়, তর্কশাস্ত্রে পারদর্শিতা নয়। অনুভূতি দমন করে শুধু তত্ত্বচিন্তা ও পাণ্ডিত্যের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ হবে না। অনুভূতি ও ধ্যান দুই-ই ভালো, উভয়েরই প্রায়োজন; কিন্তু জীবনের চরম অর্থ লুকানো আছে এ দু'য়ের পশ্চাতে। তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি—এই উভয়ের দাবীই মেটানো উচিত; কেউ অবজ্ঞার পাত্র নয়; আবার একটিকে প্রাধান্য দিলেও ভুল করা হবে। দু'টি দাবীই শুনতে হবে মন দিয়ে। সিদ্ধার্থ এখন থেকে শুধুই আত্মার আজ্ঞা পালন করবে; শুধু সেখানেই থামবে যেখানে পাবে বিবেকের নির্দেশ।

বুদ্ধত্ব-লাভের শুভক্ষণে গৌতম বোধি বৃক্ষের নিচে কেন বসেছিলেন ? তিনি একটি স্বর শুনতে পেয়েছিলেন ; অন্তরবাসী আত্মার আদেশ এল ওখানে বিশ্রাম নিতে। গৌতম সেই আদেশ শিরোধার্য করলেন। দেহের পীড়ন, স্নান, আহার, প্রার্থনা, নিদ্রা, স্বপ্ন—সব থেকে বিরত হলেন তিনি। শুনলেন শুধু বিবেকের নির্দেশ, বোধি বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসলেন বিশ্রাম করতে। আর কারো নির্দেশ কানে তুলব না, শুনব শুধু অন্তরের আহ্বান,—আর সেই আহ্বানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকব। এই তো উত্তম পথ, একমাত্র পথ ; আর কোনো উপদেশের প্রয়োজন নেই।

সেদিনকার পথ-চলা শেষ হলো খেয়া ঘাটে। পাটনীর কুটিরে আতিথ্য গ্রহণ করল সিদ্ধার্থ। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখল। দেখল, বৌদ্ধ ভিক্ষুর গৈরিক বস্ত্রে সজ্জিত গোবিন্দ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিষণ্ণ কণ্ঠে গোবিন্দ প্রশ্ন করল, "আমাকে ছেড়ে এলে কেন ?" সিদ্ধার্থ গোবিন্দকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল; কিন্তু একি ? গোবিন্দ কোথায় মিলিয়ে গেছে, তার বাহু বন্ধনে ধরা দিয়েছে এক নারী। তার অঙ্গবাসের অন্তরাল থেকে দেখা দিল পরিপূর্ণ স্তন। সিদ্ধার্থ সেই অপরিচিতার বুক থেকে মধুর বলপ্রদ পীযূষধারা পান করতে লাগল প্রাণ ভরে। নারী ও পুরুষ, সূর্য ও বন, প্রাণী ও পুষ্প, সকল ফলের মাধুর্য্য এবং সমুদয় আনন্দের স্বাদ মিশে আছে এই

অভিনব পানীয়ের মধ্যে।) সিদ্ধার্থের যখন ঘুম ভাঙল তখন কুটিরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল নদীর ক্ষীণজ্যোতি স্রোতধারা। দূরের কোন বনে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে একটা পেঁচা ডেকে উঠল।

রাত্রি শেষ হলো। সিদ্ধার্থ পাটনীকে অনুরোধ করল নদী পার করে দিতে। বাঁশের ভেলায় করে পাটনী সিদ্ধার্থকে নদী পার করে দিল। প্রভাত সূর্যের বক্তিম কিরণপাতে নদীর চওড়া বুক ঝলমল করছে।

সিদ্ধার্থ বলল, "বড় সুন্দর নদী।"

পাটনী বলল, "হ্যাঁ, সত্যি খুব সুন্দর নদী। পৃথিবীতে এই নদীর মতো আর কিছু ভালোবাসি না। কান পেতে ওর কুলু কুলু ধ্বনি শুনি, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। এবং এই নদীর কাছ থেকে আমি সর্বদাই কিছু-না-কিছু শিখতে পাই। নদীর কাছ থেকে কত কি শেখবার আছে।"

ওপারের ঘাটে নেমে সিদ্ধার্থ বলল, "তোমাকে ভাই অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু ভাড়া দেবার পয়সা আমার নেই ; উপহার বলে কিছু যে দেব তেমন কিছু জিনিসও নেই। আমি ব্রাহ্মণপুত্র, এবং সন্ন্যাসী।"

নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে পাটনী বলল, "তা তো দেখেই বুঝেছি। তোমার কাছ থেকে ভাড়া কিংবা উপহার আমি আশা করিনি। অন্য কোন সময় যখন সুবিধে হবে তখন পারের কড়ি মিটিয়ে দিও।"

তরল কণ্ঠে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি সত্যি তাই মনে কর?"

—"নিশ্চয়, আমি নদীর কাছ থেকেই শিখেছি সব কিছু ফিরে আসে। হে সন্ন্যাসী, তুমিও একদিন ফিরে আসবে। এখন তা-হ'লে যাই; তোমার বন্ধুত্ব দিয়ে ভাড়া শোধ করে দাও। যখন দেবতার অর্চনা করবে তখন আমার জন্য একটু প্রার্থনা করো।"

হাসিমুখে তারা বিদায় গ্রহণ করল। পাটনীর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে সিদ্ধার্থ আনন্দ লাভ করেছে। অনেকটা যেন গোবিন্দের মতো মনে হলো এই খেয়াঘাটের মাঝিকে। গোবিন্দের কথা মনে পড়তেই সিদ্ধার্থের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যত লোকের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে সবার মধ্যে সে দেখতে পেয়েছে গোবিন্দের ছায়া। সকলেই কৃতজ্ঞ তাকে পেয়ে, অথচ সে কৃতজ্ঞতা তাদের প্রাপ্য। সকলেই অনুগত, সকলেই চায় বন্ধু হতে, প্রশ্ন না করে মেনে নেয় তার কথা। লোকগুলি শিশুর মতো।

দুপুরবেলা সিদ্ধার্থ এসে পৌঁছল এক গ্রামে। দু'পাশে ছোট ছোট মাটির ঘর, মাঝখানে সরু গলি। সে গলিতে ছেলে-মেয়েরা নেচে নেচে খেলা করছে, হুড়োহুড়ি করছে, আর হল্লা করছে মনের আনন্দে। কিন্তু অচেনা সন্ন্যাসী এগিয়ে আসতেই তারা ভয়ে পালিয়ে গেল। গ্রামের প্রান্তে পথ চলেছে একটি নদিকার পাশে পাশে, এঁকে বেঁকে। জলের ধারে বসে একটি

তরুণী কাপড় কাচছে ; সিদ্ধার্থ তাকে সম্ভাষণ জানাল। তরুণী হাসিমুখে চোখ তুলে তাকাল ; সিদ্ধার্থ লক্ষ্য করল তার চোখের শাদা অংশ ঝক্ ঝক্ করছে। রীতিসম্মত আশীর্বাদ করে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল নগরে পেঁছবার পথ আর কতটা আছে। তরুণী উঠে এল তার কাছে। তরুণীর নধর মুখমণ্ডলে রসসিক্ত প্রদীপ্ত ওষ্ঠাধর প্রলোভন জাগায়। সিদ্ধার্থের সঙ্গে হাল্‌কা আলাপ করল কিছুক্ষণ ; জানতে চাইল খাওয়া হয়েছে কি-না ; তারপর প্রশ্ন করল, সন্ন্যাসীদের নারীহীন নিঃসঙ্গ শয্যায় রাত কাটাতে হয় বনে,—একি সত্যি ? তারপর আরো এগিয়ে এসে বাঁ পা রাখল সিদ্ধার্থের ডান পা'র উপর, মনোমুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে ইঙ্গিত করল,—মেয়েদের কাছ থেকে যে ইঙ্গিত পেয়ে পুরুষের রক্তে আগুন ধরে। সিদ্ধার্থের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, মনে পড়ল গত রাত্রির স্বপ্নের কথা। সে নত হয়ে তরুণীর বুকে একটি চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দিল। চেয়ে দেখল তরুণীর হাস্যস্ফুরিত মুখ আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল, তার অর্ধনিমীলিত চোখে কামনার মিনতি।

কামনার তাড়নায় সিদ্ধার্থের রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, জেগে উঠেছে তার ঘুমন্ত পৌরুষ। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু মন এখনো তৈরী হয়নি। কখনো নারী স্পর্শ করেনি, তাই একটু দ্বিধা দেখা দিয়েছে। সেই দ্বিধার সংকীর্ণ মুহূর্তে অকস্মাৎ শুনতে পেল অন্তরবাসী আত্মার নির্দেশ : না, এখনো নয়!

সহসা তরুণীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ থেকে সকল যাদু দূর হয়ে গেল। শুধু একটি যুবতীর কামনার জ্বলন্ত দৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নেই সেই মুখে। তরুণীর গালে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ দ্রুত পায়ে পথের বাঁকে বাঁশ বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আশাহত যুবতী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অচেনা পথিকের অজানা পথের দিকে।

সন্ধ্যার পূর্বেই সিদ্ধার্থ নগরে এসে পেঁাছল। সুখী হলো সে। মনে জেগেছে জনতার মধ্যে বাস করবার আকাঙ্ক্ষা। দীর্ঘকাল কেটেছে বনে, লোকালয়ের বাহিরে। কাল রাত্রিতে ছিল পাটনীর কুটীরে। কতদিন পরে ছাদের নিচে ঘুমিয়েছে।

শহরের উপকণ্ঠে মনোরম উদ্যানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সিদ্ধার্থের চোখে পড়ল একটি ছোট শোভাযাত্রা। একদল ঝি-চাকর চলেছে নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ ঝুড়ি মাথায় করে। আর মাঝখানে কর্ত্রী চলেছেন কারুকার্য খচিত চতুর্দোলায় চড়ে। কর্ত্রী বসেছেন লাল গদীতে, মাথার উপর খাটানো হয়েছে রঙান চাঁদোয়া। চারজন বেহারা তালে তালে পা ফেলে চতুর্দোলা কাঁধে করে চলেছে। উদ্যানের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ শোভাযাত্রা দেখেছে,—ঝি, চাকর, দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ ঝুড়ি। তারপরে এল কর্ত্রীকে নিয়ে চতুর্দোলা। একরাশ কালো চুলের নিচে উজ্জ্বল, বড় মধুর, অতিশয় বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানি ; সদ্য-কাটা ডুমুরের মতো রক্তিম ওষ্ঠাধর ; গভীর কালো চোখে সজাগ দৃষ্টি ;

একজোড়া সূক্ষ্ম ভ্রূ,—মনে হয় যেন তুলি দিয়ে আঁকা। সবুজ শাড়ীর সোনালী পাড় ছাড়িয়ে দেখা যায় সুকুমার গ্রীবা; দৃঢ় ও মসৃন, দীর্ঘ ও কমনীয় দুই বাহু; মণিবন্ধ জুড়ে আছে সোনার বালা।

এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে সিদ্ধার্থ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। চতুর্দোলা তার গা ঘেঁসে যাবার সময় মাথা নত করে অভিবাদন জানাল, একবার তাকল সেই রূপদীপ্ত মুখের দিকে, একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো রমণীর বঙ্কিম চোখের উপর। বাতাসে ভেসে এল অজানা সুগন্ধির সুবাস, সিদ্ধার্থ যার পরিচয় আগে কখনো পায়নি। এক লহমার জন্য রূপসী রমণী সহাস্যে মাথা হেলিয়ে সিদ্ধার্থকে স্বীকৃতি জানাল; তারপর চতুর্দোলা অদৃশ্য হয়ে গেল উদ্যানের মধ্যে।

সিদ্ধার্থ মনে মনে ভাবল, বড় শুভক্ষণে এসেছি এই নগরে। তখুনি শোভাযাত্রার পেছনে পেছনে উদ্যানে প্রবেশ করবার প্রবল ইচ্ছা হলো। কিন্তু মনে পড়ল ঝি-চাকরের দল তাকে অবজ্ঞা ও সন্দেহসূচক দৃষ্টি দিয়ে অগ্রাহ্য করে গেছে।

সিদ্ধার্থের খেয়াল হলো, এখনো আমি সন্ন্যাসী, এখনো ভিক্ষুক। এ বেশে তো উদ্যানে যাওয়া যায় না। সিদ্ধার্থ নিজের নির্বোধ আকাঙ্ক্ষার কথা মনে করে হেসে উঠল।

রাস্তায় প্রথম যার সঙ্গে দেখা হলো তাকে জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধার্থ জানতে পারল চতুর্দোলার রমণীর নাম কমলা,—

সুপরিচিতা বারাঙ্গনা। এই বাগানবাড়ী ছাড়া শহরে তার আরো বাড়ী আছে। তারপর সিদ্ধার্থ শহরে প্রবেশ করল। একটিমাত্র লক্ষ্য তার। সেই লক্ষ্যের কথা মনে রেখে শহর পর্যবেক্ষণ করতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, নগরের আঁকা-বাঁকা পথে পথে ঘুরে বেড়াল, কোথাও বা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, আবার হয়তো শান বাঁধানো নদীর ঘাটে বসে বিশ্রাম করল। সন্ধ্যাবেলা আলাপ হলো এক নাপিতের সঙ্গে। দু'জনে মিলে আরতি দেখতে গেল বিষ্ণু মন্দিরে। লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর কাহিনী শুনিয়ে নাপিতের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলল সিদ্ধার্থ। নদীর ঘাটে বাধা একটা নৌকায় রাতটা কাটিয়ে দিল। পরদিন খুব সকালে, অন্য কোনো খদ্দের আসবার আগেই, নাপিতকে দিয়ে দাড়ি কামিয়ে পরিচ্ছন্ন হলো। নাপিত সুগন্ধি তেল দিয়ে তার কেশবিন্যাসও করে দিল। নদী থেকে যখন স্নান করে এলো তখন আর চেনা যায়না সিদ্ধার্থকে,—একেবারে নতুন মানুষ।

তখন অপরাহ্ন। সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়িয়েছে উদ্যানের প্রবেশ পথে। কমলা পূর্ব দিনের মতোই এলো চতুর্দোলা চড়ে। সিদ্ধার্থ অভিবাদন জানাল, পেল প্রত্যভিবাদন। দলের সকলের শেষে ছিল যে ভৃত্য সিদ্ধার্থ ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডেকে আনল; বলল, "তোমার কর্ত্রীকে বলো একজন ব্রাহ্মণ যুবক দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছে।" একটু

পরে ভৃত্য ফিরে এল, সিদ্ধার্থকে লতামণ্ডপে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

লতামণ্ডপে আরাম করে গা এলিয়ে বসে ছিল কমলা। সিদ্ধার্থকে দেখে প্রশ্ন করল, "কাল পথে দাঁড়িয়ে তুমিই তো আমাকে নমস্কার করেছিলে?"

—"হ্যাঁ, কাল আমিই তোমাকে অভিবাদন জানিয়েছিলাম।"

—"কিন্তু কাল তো তোমার মুখ ছিল দাড়িতে ঢাকা, মাথায় ছিল ধূলায় জট পাকানো লম্বা চুল; তাই না?"

—"তোমার চোখে কিছুই এড়ায়নি। খুব ভালো করেই লক্ষ্য করেছ দেখছি। তুমি ব্রাহ্মণ কুমার সিদ্ধার্থকে কাল দেখেছ,—যে সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করেছে এবং যে তিন বছর সন্ন্যাসী হয়ে বনে বনে ঘুরেছে। এখন আমি সন্ন্যাস ত্যাগ করে এই নগরে এসেছি। নগরে প্রবেশ করবার পূর্বে সর্বপ্রথম তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কমলা, আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে, তুমিই আমার জীবনে প্রথম স্ত্রীলোক যার সঙ্গে চোখ নত না করে কথা বলছি। সুন্দরী মেয়েদের দেখলে আর কখনো তপস্বীদের মতো দৃষ্টি ভূমিনিবদ্ধ করব না।"

ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরী বর্ণোজ্জ্বল পাখাটা নিয়ে খেলা করতে করতে একটু হেসে কমলা জিজ্ঞাসা করল, "শুধু একথা বলতেই কি সিদ্ধার্থ এসেছে?"

—"একথা বলতে এসেছি, আর এসেছি তোমার অপূর্ব সৌন্দর্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে। কমলা, তুমি যদি রাগ না কর তাহ'লে অনুরোধ করব আমাকে তোমার বন্ধু করে নাও। তাছাড়া, তুমি হবে আমার গুরু। যে বিদ্যায় তুমি পারদর্শিনী, সে বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।"

উচ্চস্বরে হেসে উঠল কমলা।

—"অরণ্য থেকে সন্ন্যাসী আসবে আমার ছাত্র হয়ে একথা কখনো কল্পনাও করিনি। মাথা ভরা লম্বা চুল নিয়ে এবং পুরনো ছেঁড়া কৌপীন পরে আর কেউ আসেনি আমার সামনে। ব্রাহ্মণ কুমার এবং অন্যান্য যুবকরা আমার কাছে আসে মহার্ঘ পোষাক পরে, পায়ে থাকে চমৎকার চকচকে জুতা; তাদের চুলে থাকে সুগন্ধি, আর পেটিকা থাকে অর্থে পূর্ণ। হে সন্ন্যাসী, তরুণরা আমার কাছে এভাবেই আসে।"

সিদ্ধার্থ বলল, "আমি এর মধ্যেই তোমার কাছ থেকে শিখতে আরম্ভ করেছি। কাল যা শিখেছি তারই ফলে দাড়ি কামিয়েছি, তেল মেখেছি মাথায়, সযত্নে কেশবিন্যাস করেছি। মূল্যবান বস্ত্র, সুন্দর জুতা এবং অর্থ দুষ্প্রাপ্য বস্তু নয়। এর চেয়ে অনেক কঠিন জিনিস চেয়ে তা লাভ করেছি। সে তুলনায় এসব তো তুচ্ছ! কাল যা সঙ্কল্প করেছি তা-ই বা পাবো না কেন? একবার দেখেই স্থির করেছি তোমার বন্ধুত্ব লাভ করতে হবে আর তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে

প্রেমের কলা। কমলা, তুমি দেখবে আমি উপযুক্ত ছাত্র হবো। তোমার কাছ থেকে যা শিখতে চাই তার চেয়ে ঢের কঠিন জিনিস আমি আয়ত্ত করেছি। সিদ্ধার্থের যা সত্য পরিচয় তাতে তুমি সন্তুষ্ট নও; মাথায় তেল মাখলে শুধু চলবে না—চাই পোষাক, পাদুকা, অর্থ।"

কমলা হেসে বলল, "না, এখনো সে যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেনি। তার চাই পোষাক, মহার্ঘ সুন্দর পোষাক; চাই পাদুকা, দামী চমৎকার পাদুকা; চাই প্রচুর অর্থ এবং কমলার জন্য বিবিধ উপহার। কি গো, সন্ন্যাসী, এখন জানলে কি কি চাই? বুঝতে পারলে তো?"

—"ভালো করেই বুঝেছি," সিদ্ধার্থ বলল। "তোমার কথা না বুঝবার তো কারণ নেই। কমলা, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমার দু'ভাগ করে কাটা তাজা ডুমুরের কথা মনে পড়ে। চেয়ে দেখ, আমার মুখও রক্তিম ও সরস। দেখবে, তোমার মুখের সঙ্গে বেশ মানাবে। কিন্তু, সত্যি করে বলো তো কমলা, বনবাসী যে সন্ন্যাসী তোমার কাছে প্রেমের পাঠ গ্রহণ করতে এসেছে, তাকে দেখে কি একটুও ভয় হচ্ছে না?"

—"বাঃ, বন থেকে যে নির্বোধ সন্ন্যাসী এসেছ, তাকে ভয় করবার কি আছে? বনে তার সঙ্গী ছিল শেয়ালের দল, মেয়েদের সম্বন্ধে সে কি জানে?"

—"ও, তুমি জানো না সন্ন্যাসীদের কতো শক্তি, তারা কত নির্ভীক। সুন্দরী, সে তোমার উপর বলপ্রয়োগ করতে পারে, তোমার ধনরত্ন লুণ্ঠন করতে পারে, আর পারে আঘাত করতে।"

—"সন্ন্যাসী, আমার ভয় নেই। তোমাদের মনে কি কখনো ভয় হয় যে দস্যু জোর করে তোমাদের জ্ঞান, ধর্ম ও ধ্যানের শক্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে? তেমন আশঙ্কা হয় না; কারণ, এই গুণগুলি অধিকারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সন্ন্যাসীর ইচ্ছা হলে এর যতটুকু খুসী ততটুকু দান করতে পারে। ঠিক তেমনি কমলার কাছ থেকে কেউ জোর করে প্রেমের সুধা আদায় করে নিতে পারবে না। এই যে কমলার সুন্দর রক্তিম ওষ্ঠাধর দেখছ, সুধায় পূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুম্বন করলে এক ফোঁটা মধুও পাবে না। সিদ্ধার্থ, তুমি উপযুক্ত ছাত্র, সুতরাং এই তত্ত্বটি শিখে রাখ। জেনে রাখ যে প্রেম ভিক্ষা করে পেতে পার, পয়সা দিয়ে কেনা যায়, উপহার পাওয়া যেতে পারে, এমন কি পথের ধারে অকস্মাৎ প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব নয়,—কিন্তু প্রেম চুরি করা যায় না। তুমি ভুল বুঝেছ। তোমাদের মতো সুন্দর যুবকরা ভুল বুঝলে দুঃখের কথা হবে।"

সিদ্ধার্থ ভুল স্বীকার করে হাসল; বলল, "তুমি ঠিক বলেছ

কমলা ; এটা দুঃখের কথা, খুবই দুঃখের কথা হবে। তোমার অধর থেকে, আমার মুখ থেকে, এক বিন্দু সুধারও যেন অপচয় না ঘটে। আজ আমার উপযুক্ত বেশভূষা নেই, পাদুকা নেই, অর্থ নেই ; এসব যেদিন সংগ্রহ করতে পারব সেদিন আবার তোমার কাছে ফিরে আসব। কিন্তু কমলা, তুমি আমাকে একটু পরামর্শ দেবে ?"

—"পরামর্শ ? কেন দেব না ? বনের শেয়ালদের মধ্যে থেকে যে দরিদ্র, অনভিজ্ঞ সন্ন্যাসী লোকালয়ে এসেছে তাকে স্বেচ্ছায় পরামর্শ দিয়ে কে না সাহায্য করবে ?"

—"কমলা, এই তিনটি জিনিস যথাসম্ভব শীঘ্র কি করে পেতে পারি ?

—"বন্ধু, বহুলোক এই প্রশ্ন করে। তোমার যে বিদ্যা জানা আছে তারই সাহায্যে অর্থ উপার্জন করবে, পোষাক ও পাদুকা কিনবে। দরিদ্রের অন্য পথ নেই।"

—"আমি ধ্যান করতে পারি, অপেক্ষা করতে পারি, আর পারি উপবাস করতে।"

—"আর কিছু নয় ?"

—"কিছু না। হ্যাঁ, পারি, কবিতা লিখতে পারি। একটি কবিতার বিনিময়ে একটি চুম্বন দেবে ?"

—"দিতে পারি যদি তোমার কবিতা ভালো লাগে। তোমার কবিতার নাম কি ?"

এক মুহূর্ত ভেবে সিদ্ধার্থ আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল :

কমলা কুঞ্জে আসে,
গৌরবরণ শ্রমণ দাঁড়াল দ্বারে।
কমলিনীটিরে স্বাগত জানায় একটি নমস্কারে,
মাথাটি নোয়ায়ে মোহিনী কমলা হাসে !
শ্রমণ ভাবিল, "এই ভালো, এই ভালো !
দেবতার কাছে আত্মবলির চেয়ে
কমলার পায়ে যজ্ঞ-প্রদীপ জ্বালো !"

আবৃত্তি শেষ হতেই কমলা হাততালি দিয়ে উঠল; সেই শব্দের সঙ্গে মিশল সোনার বালার নিক্কণ।

—"হে পিঙ্গলবর্ণ সন্ন্যাসী, চমৎকার তোমার কবিতা। এ কবিতার বিনিময়ে তোমাকে একটি চুম্বন উপহার দিলে নিশ্চয়ই ঠকতে হবে না।"

চোখের ইঙ্গিতে কমলা তাকে কাছে টেনে আনল। একটি মুখ এল আর একটি মুখের উপর, সিদ্ধার্থ স্পর্শ করল সদ্য কাটা ডুমুরের মতো লোভনীয় কমলার ওষ্ঠাধর। সিদ্ধার্থ বিস্মিত হয়ে গেল, কমলার একটি গভীর চুম্বন তাকে মুহূর্তের মধ্যে কত শিক্ষা দিয়েছে, প্রেমের বিদ্যায় তার কী নিপুণতা ! কমলা তাকে অভিভূত করেছে, বিতৃষ্ণা জাগিয়েছে, প্রলুব্ধ করেছে। এই একটি প্রলম্বিত চুম্বনের পর তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল শ্রেণীবদ্ধ আর একটি চুম্বনের মালা ; প্রত্যেকটি চুম্বনের স্বাদ আলাদা, অনুভূতি

নতুন। একটু সরে এসে দাঁড়াল সিদ্ধার্থ, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। হঠাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা শিশুর মতো সে চম্‌কে উঠল।)

কমলা বলল, "তোমার কবিতা খুব ভালো লেগেছে আমার। যদি আমার অনেক টাকা থাকত তাহ'লে তোমাকে এর জন্য মূল্য দিতাম। কিন্তু তুমি যে পরিমাণ টাকা চাও কবিতা লিখে তা পাওয়া বড়ই শক্ত। কমলার বন্ধুত্ব লাভ করতে হলে তোমাকে অনেক টাকা উপার্জন করতে হবে।"

—"কমলা, কী অপূর্ব চুমা দিতে পারো তুমি!"—অস্পষ্ট স্বরে থেমে থেমে বলল সিদ্ধার্থ।

—"হাঁ, পারি বলেই তো আমার সাজ-পোষাক, অলঙ্কার আরো কত ভালো ভালো জিনিসের অভাব নেই, কিন্তু তুমি এখন কি করবে? ধ্যান, উপবাস ও কাব্যরচনা ছাড়া আর কিছুই কি তুমি পারো না?"

—"আমি যজ্ঞের গান জানি,—কিন্তু সে গান তো আর গাইব না। যাদু মন্ত্রও জানি, সে মন্ত্রও প্রয়োগ করা এখন সম্ভব নয়। শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি "

—"থামো,"—কমলা বাধা দিল, "তুমি লিখতে পড়তে জান?"

—"নিশ্চয়ই জানি। সে তো অনেকেই জানে।"

—"আবার অনেকেই জানে না। যেমন আমি। তুমি যে লেখা-পড়া জান এটা সত্যি আশার কথা; খুব ভালো কথা। তোমার হয়তো মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহারেরও দরকার হতে পারে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন ভৃত্য এসে চুপি চুপি কর্ত্রীর কানে কি বলল। কমলা ব্যস্ত হয়ে উঠল, "সিদ্ধার্থ, আমার একজন অতিথি এসেছে; তুমি তাড়াতাড়ি পালাও এখান থেকে; কেউ যেন দেখতে না পায়। কাল আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

সেই ব্যস্ততার মধ্যেও কমলা ভৃত্যকে আদেশ করল ব্রাহ্মণকে নতুন কাপড় দেবার জন্য। কী ঘট্‌ছে ভালো করে বোঝবার আগেই ভৃত্য সিদ্ধার্থকে আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে ঘুরিয়ে বাগান বাড়ীতে নিয়ে এল। নতুন কাপড় পেয়ে ভৃত্যের নির্দেশ অনুসারে ঝোপ-ঝাড়ের পথে চুপি চুপি উদ্যান পার হয়ে পথে এসে পৌঁছল।

নতুন কাপড় বগলদাবা করে পরিতৃপ্ত মনে নগরে ফিরে এল সিদ্ধার্থ। পান্থশালায় পথিকের দল ভিড় করেছে। সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়াল এক কোণে, নীরবে খাদ্যের প্রার্থনা জানাল। তখনো সন্ন্যাসীর কৌপীন পরে আছে; সসম্মানে আহার্য এনে দেওয়া হল তার সামনে। হয়তো কাল, মনে মনে ভাবল সিদ্ধার্থ, ভিক্ষা করে খেতে হবে না।

হঠাৎ আত্মসম্মান বোধ প্রবল হয়ে উঠল। সে তো আর সন্ন্যাসী নয় ; ভিক্ষা করা এখন শোভা পায় না। ভাতের থালা কুকুরকে দিয়ে সিদ্ধার্থ অনাহারে রইল।

সিদ্ধার্থের মনে হলো এখানকার জীবনযাত্রা তো বেশ সরল। কোন জটিলতা নেই। সন্ন্যাসীর জীবন ছিল জটিলতাপূর্ণ, ক্লান্তিকর, এবং শেষে তা নিরাশায় কালো হয়ে উঠেছিল। কমলার চুম্বন শিক্ষার প্রথম পাঠের মতো এখানকার জীবন স্বচ্ছন্দপ্রবাহ। এখন আমার চাই অর্থ, চাই সুন্দর বেশভূষা। এতো আর এমন বেশী চাওয়া নয় যার জন্য রাত্রিতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে ?

নগরে কমলার যে বাড়ী ছিল সন্ধান করে পরদিন সিদ্ধার্থ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো।

দূর থেকে দেখতে পেয়েই কমলা ডেকে বলল, "সুসংবাদ আছে। কামস্বামী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তার নাম শোননি ? সে নগরের সবচেয়ে ধনী শ্রেষ্ঠি। তাকে প্রসন্ন করতে পারলে চাকুরী হবে। তোমার যে সকল কাজে দক্ষতা আছে আলাপে যেন কামস্বামী তা বুঝতে পারে। আমি লোক মারফৎ তোমার কথা তাকে বলে পাঠিয়েছি। তার বন্ধুত্ব কামনা করবে, খুব প্রতিপত্তি তার ; কিন্তু তাই বলে অতি বিনয়ী হয়ো না। আমি চাই না যে তুমি কামস্বামীর অনুগত ভৃত্য হবে ; তার সমকক্ষ হয়ে চলবে ; তা যদি না পার তাহ'লে আমি অসন্তুষ্ট হবো। কামস্বামীর বয়স যত বাড়ছে ততই অলস

হয়ে উঠেছে। তুমি যদি তাকে সন্তুষ্ট করতে পার তাহ'লে তোমার উপরে বিশেষরূপে সে নির্ভর করবে।”

সিদ্ধার্থ হাসিমুখে তাকে ধন্যবাদ জানাল। দুদিন খাওয়া হয়নি শুনে কমলা তাড়াতাড়ি খাবার আনিয়ে যত্ন করে খাওয়াল সিদ্ধার্থকে।

বিদায় নেবার সময় কমলা বলল, “তোমার ভাগ্য ভাল। একের পর এক তোমার জন্য পথ উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হলো? কোন কবচ-টবচ আছে নাকি?”

সিদ্ধার্থ বলল, “কাল তো বলেছি আমি জানি চিন্তা করতে, অপেক্ষা করতে ও উপবাস করতে। তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছ, এ গুণগুলি নাকি কোন কাজেই লাগে না। কিন্তু তুমি দেখবে যে এদেরও প্রয়োজন আছে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে বনের নির্বোধ সন্ন্যাসীরা অনেক দরকারী জিনিস শিখে। পরশু ভিক্ষুকের অবিন্যস্ত বেশে এসেছিলাম, কালই কমলাকে চুম্বন করবার অধিকার পেয়েছি; এবং শীগগীরই ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করব এবং তোমার কাছে যে-সব জিনিসের মূল্য তা সংগ্রহ করতে পারব।”

কমলা স্বীকার করল; বলল, “ঠিক, কিন্তু আমি না থাকলে তোমার কি দশা হতো? আজ কোথায় থাকতে তুমি?”

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, “তোমার উদ্যানে আসা আমার প্রথম ধাপ। আমার উদ্দেশ্য ছিল শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর কাছ থেকে প্রেমের

পাঠ গ্রহণ করব। যে মুহূর্তে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি তখনই আমি জানতাম যে আমার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হবে। আমি জানতাম তুমি আমাকে সাহায্য করবে। উদ্যানের প্রবেশ-পথে তোমার প্রথম কটাক্ষপাত থেকেই তা বুঝেছি।"

—"আমি যদি সাহায্য করতে না চাইতাম ?"

—"কিন্তু তুমি চেয়েছ। শোন কমলা, জলের মধ্যে ঢিল ছুঁড়ে মারলে তলদেশে পৌঁছবার দ্রুততম পথটা ঢিল বেছে নেয়। একটা সঙ্কল্প গ্রহণ করলে সিদ্ধার্থের অবস্থাও ঢিলের মতো হয়। সিদ্ধার্থ কিছুই করে না ; সে অপেক্ষা করে, ধ্যান করে, আর করে উপবাস; সে এই সংসারের ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ঠিক তেমনি করে চলে যেমন তলদেশগামী ঢিল জলের মধ্য দিয়ে চলে . সে আকর্ষণ অনুভব করে, বাধা দেয় না, আকর্ষণের পথ ধরে চলতে থাকে। সিদ্ধার্থকে আকর্ষণ করে তার লক্ষ্য ; লক্ষ্যে উপস্থিত হবার পরিপন্থী কোন ভাবনাই সে মনে স্থান দেয় না। সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সিদ্ধার্থ এই শিক্ষা লাভ করেছে। নির্বোধরা একেই বলে যাদু, তারা মনে করে অসম্ভবকে সম্ভব করে দানব। কোন কাজই দানব করে না; কারণ ওদের অস্তিত্বই নেই। প্রত্যেকেই যাদুখেলা দেখাতে পারে, প্রত্যেকেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, যদি সে ধ্যান, প্রতীক্ষা ও উপবাস করতে পারে।"

কমলা নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল তার কথা।

সিদ্ধার্থের কণ্ঠস্বর, ভাসা ভাসা চোখের স্নিগ্ধ চাউনি বড় ভালো লাগল তার।

মৃদু কণ্ঠে কমলা বলল, "হয়তো তোমার কথাই সত্য, বন্ধু। আবার অন্য কারণও হতে পারে। হয়তো তুমি রূপবান, তোমাকে দেখে মেয়েরা মুগ্ধ হয়, এবং তুমি সৌভাগ্যশালী বলেই তোমার পক্ষে সিদ্ধিলাভটা সহজ হয়ে ওঠে।"

সিদ্ধার্থ কমলাকে চুম্বন করে বিদায় নিল : "হে আমার আচার্য, তাই হোক। আমার চোখ যেন তোমাকে চিরদিন আনন্দ দিতে পারে, এবং সৌভাগ্যের দান যেন সর্বদা তোমার হাত থেকেই গ্রহণ করতে পারি।"

জনপদ

কামস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছে সিদ্ধার্থ। প্রকাণ্ড ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদ। ভৃত্য পথ দেখিয়ে সুসজ্জিত কক্ষে এনে বসাল। গৃহকর্তার প্রতীক্ষা করতে লাগল সিদ্ধার্থ।

কামস্বামী প্রবেশ করল; নধর, প্রাণবন্ত পুরুষ; চুলে সাদার ছোপ লাগতে শুরু হয়েছে; বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ; মুখে ভোগলালসার ইঙ্গিত। গৃহস্বামী এবং অতিথি পরস্পরের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ অভিবাদন বিনিময় করল।

শ্রেষ্ঠী বলল, "আমি শুনেছি আপনি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ব্যক্তি; কিন্তু বণিকের দপ্তরে কর্মপ্রার্থী। আপনি চাকুরীর সন্ধান করছেন কেন? আপনি কি অভাবগ্রস্থ?"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "না, আমার অভাব নেই; এখনও নেই, পূর্বেও কখনো ছিল না। বহুদিন আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাস করেছি, তাদের মধ্য থেকেই আসছি।"

—"সন্ন্যাসীদের সমাজ থেকে যদি এসে থাকেন তাহ'লে অভাব নেই কি রকম? সন্ন্যাসীরা কি সম্পূর্ণ নিঃস্ব নয়?"

সিদ্ধার্থ বলল, "জাগতিক অর্থে সত্যি আমার কিছু নেই ; কিন্তু আমি রিক্ত হয়েছি স্বেচ্ছায় ; সুতরাং আমার অভাববোধ নেই।"

—"কিন্তু নিঃস্ব হলে বাঁচবেন কি করে ?"

—"সে কথা কখনো ভাবিনি। প্রায় তিন বছর নিঃস্ব অবস্থায় বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছি, কি করে বাঁচব সে কথা একবারও চিন্তা করিনি।"

—"তাহ'লে অন্য লোকের সম্পত্তির উপর জীবন ধারণ করেছেন ?"

—"বাইরে থেকে তাই মনে হয়। শ্রেষ্ঠীরাও অপরের সম্পত্তির উপর বেঁচে আছে।"

—"ঠিক বলেছেন, কিন্তু বণিক শুধু শুধু অপরের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে না ; বিনিময়ে সে দেয় পণ্যসামগ্রী।"

—"তাই তো নিয়ম। সকলেই নেয়, সকলেই দেয়। জীবনটাই এই দেয়া-নেয়ার কারবার।"

—"কিন্তু কিছুই যদি না থাকে, তাহ'লে দেব কি করে ?"

—"যার যা আছে সে তো তা-ই দিতে পারে। সৈন্য দেয় বল, বণিক দ্রব্যসম্ভার, আচার্য শিক্ষা, কৃষক চাল এবং জেলে দেয় মাছ।"

—"বেশ, কিন্তু আপনি কি দিতে পারেন ? এমন কি শিখেছেন যা দান করা সম্ভব ?"

—"আমি চিন্তা করতে পারি, অপেক্ষা করতে পারি, আর পারি উপবাস করতে।"

—"এই কি সব?"

—"আমার তো তাই মনে হয়।"

—"এদের দিয়ে কি হয়? ধরা যাক, উপবাস; উপবাস কি কাজে লাগে?"

—"উপবাসের মূল্য অনেক। খাবার না থাকলে সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হলো উপবাস করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে উপবাসের বিদ্যা জানা না থাকলে সিদ্ধার্থকে আজ যে কোনো চাকুরী নিতে হতো; ক্ষুধার জ্বালা তাকে বাধ্য করত আপনার দপ্তরে কিংবা অন্য কোথাও চাকুরী নিতে। কিন্তু সিদ্ধার্থ ধীরভাবে অপেক্ষা করতে পারে। তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, তার অভাববোধ নেই, ক্ষুধাকে দীর্ঘকাল সে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, ক্ষুধার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে পারে। সুতরাং, হে শ্রেষ্ঠীপ্রবর, উপবাসেরও প্রয়োজন আছে।"

—"তপস্বী, আপনি যথার্থ বলেছেন। মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন।" কামস্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে একটা গুটানো কাগজ সিদ্ধার্থের হাতে দিয়ে প্রশ্ন করল, "এটা পড়তে পারেন?"

সিদ্ধার্থ গুটানো কগজটা খুলে দেখল ওটা একটা মাল কেনা-বেচার চুক্তিপত্র। চুক্তির বিষয় সে পড়ে শোনাতে লাগল।

—"চমৎকার!" কামস্বামী শুনে বলল। তারপর সিদ্ধার্থকে এক টুকরো কাগজ এবং কলম দিয়ে বলল, "দয়া করে কিছু লিখে দিন না?"

সিদ্ধার্থ কয়েক মুহূর্ত পরেই কাগজ ফিরিয়ে দিল। কামস্বামী পড়ল: "লেখা ভালো, তার চেয়ে ভালো চিন্তা করা। নিপুণ বুদ্ধি ভালো, তার চেয়ে ভালো ধৈর্য।"

—"চমৎকার লেখা আপনার," শ্রেষ্ঠী প্রশংসায় পঞ্চমুখ। "পরে আমাদের অনেক কথা আলোচনা করতে হবে। আজ আপনাকে আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ করছি।"

সিদ্ধার্থ ধন্যবাদের সঙ্গে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। শ্রেষ্ঠীর গৃহে শুরু হলো তার নতুন জীবন। তার জন্য এলো নতুন পোষাক, নতুন পাদুকা। পরিচর্যার জন্য ভৃত্যের দল থাকে কাছে কাছে। দিনে দু'বার সুস্বাদু আহার্য আসে. কিন্তু সিদ্ধার্থ দিনে শুধু এক বেলা আহার করে; মাংস এবং সুরা স্পর্শ করে না। কামস্বামী ব্যবসায় সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলোচনা করেছে; সিদ্ধার্থকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে তার পণ্যসামগ্রী, গুদামঘর এবং হিসাবপত্রের খাতা। সিদ্ধার্থ অনেক জিনিস শিখেছে, শুনেছে অনেক নতুন কথা; কিন্তু নিজে কথা বলেছে কম। কমলার উপদেশ স্মরণ করে সে কখনো শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে প্রভুর ন্যায় ব্যবহার করেনি, তাকে দেখেছে সমকক্ষ হিসেবে,—

হয়তো নিজের অপেক্ষা একটু ছোট করে। সিদ্ধার্থ যে অধীনস্থ কর্মচারী এ কথা ভাববার সুযোগ দেয়নি কামস্বামীকে। কামস্বামী ব্যবসায় পরিচালনা করত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ; এই কাজে ছিল তার গভীর আসক্তি। কিন্তু সিদ্ধার্থের কাছে ব্যবসায় ছিল খেলার মতো ; খেলার নিয়মগুলি ভালো করে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করত সে, কিন্তু এই ব্যবসার খেলা তার মনে সাড়া জাগাতে পারত না।

অল্পদিনের মধ্যেই সিদ্ধার্থ কামস্বামীর ব্যবসায় পরিচালনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করল। কমলা সময় ঠিক করে দিয়েছিল। চিত্তবিনোদনের জন্য সেই নির্দিস্ট সময়ে সুন্দর পোষাক পরে, নতুন পাদুকা পায়ে দিয়ে যেত কমলার বাড়ী। ক্রমে হাতে টাকা এলো ; তখন থেকে কমলার জন্য নিত্য-নতুন উপহার নিয়ে যায়। কমলার বিম্ব, রক্তিম অধর থেকে সে শিখল অনেক কথা ; কমলার মসৃন, কমনীয় বাহু তাকে ইঙ্গিত দেয় নতুন জগতের। প্রেমের ব্যাপারে সিদ্ধার্থ এখনো অনভিজ্ঞ বালক। অন্ধ অতৃপ্তি নিয়ে সে প্রেমের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, দেখতে চায় গভীর তলদেশে কী আছে! কমলা তাকে শেখাল, আনন্দ না দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না ; প্রতিটি ভঙ্গী, প্রতিটি সোহাগ, প্রতিটি স্পর্শ, প্রতিটি চাউনি, দেহের প্রতিটি অংশ আনন্দ দেবার গোপন উৎস ; সে-ই আনন্দ পাবে যে এই গোপন উৎসের রহস্য জানে। কমলা শিখিয়েছে,

দয়িতার নিকট পরাজয় স্বীকার করতে হয়, আবার কখনো বিজয়ীর বেশে তার সামনে উপস্থিত হতে হয়, বৈচিত্র্যের অভাবে প্রেমের মৃত্যু ঘটে ; সিদ্ধার্থ কমলার ছাত্র, তার প্রেমিক, তার বন্ধু ; সেই সুন্দরী বারাঙ্গনার সাহচর্যে কত প্রহর আশ্চর্যরূপে মধুময় হয়ে উঠেছে। কমলার সঙ্গে প্রণয়সূত্রের মধ্যেই সিদ্ধার্থের বর্তমান জীবনের অর্থ ও মূল্য নিহিত আছে,— কামস্বামীর ব্যবসায়ে নয়।

শ্রেষ্ঠী সিদ্ধার্থকে দিল দরকারী চিঠিপত্র লেখার দায়িত্ব। ক্রমে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে সিদ্ধার্থের সঙ্গে পরমর্শ করা কামস্বামীর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। শ্রেষ্ঠী শীগগীরই বুঝতে পারল সিদ্ধার্থের চাল, পশম, জাহাজ ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বোঝবার আগ্রহ নেই। কিন্তু তার এমন একটা বিষয়ে দক্ষতা আছে যা কামস্বামীর মধ্যে পাওয়া যাবে না। সিদ্ধার্থ প্রশান্ত, তার চরিত্রে আছে স্থৈর্য ; পরম ধৈর্যের সঙ্গে সে লোকের কথা শুনতে পারে ; বিদেশী বণিকরা তার সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়। এমন একটা ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ পাওয়া যায় সিদ্ধার্থের বাক্যে ও আচরণে যা কামস্বামীর নেই। একদিন তার এক বন্ধুকে বলল কামস্বামী, "এই ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্যবসায়ী নয়, কখনো হবেও না। সে ডুবে যেতে পারে না ব্যবসার মধ্যে। কোনো কোনো লোকের মধ্যে কী একটা গোপন শক্তি থাকে যার ফলে সাফল্য তাদের কাছে আপনি এসে ধরা দেয়, সাফল্যের পশ্চাতে তাদের

ছুটতে হয় না। সিদ্ধার্থও সেই দলের। হয়তো তার জন্মক্ষণে আকাশে ছিল কোনো শুভ নক্ষত্র; হয়তো কুহক জানে; কিংবা সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে শিখে এসেছে কোনো অভিনব বিদ্যা। ব্যবসায় নিয়ে সে খেলা করে, ব্যবসায় তার মনে কখনো দাগ কাটতে পারে না, আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না তার উপর। সিদ্ধার্থ অকৃতকার্যতাকে ভয় পায় না, লোকসানের জন্য দুশ্চিন্তা নেই তার।"

বন্ধু কামস্বামীকে উপদেশ দিল, "সিদ্ধার্থ তোমার যে সব ব্যবসা দেখা শোনা করে তাদের লাভের এক তৃতীয়াংশ তাকে দাও; অবশ্য লোকসান হলে আনুপাতিক হারে ক্ষতির অংশও নিতে হবে। এমনি করে লাভ-লোকসানের সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে জড়িত হ'য় পড়লে ব্যবসায় সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে উঠবে।"

কামস্বামী বন্ধুর উপদেশ অনুসারে কাজ করল; কিন্তু সিদ্ধার্থের মনে কোনো পরিবর্তন ঘটল না। যদি লাভ হয় তবে ধীর চিত্তে লাভের অংশ গ্রহণ করে, উচ্ছ্বলিত হয় না; লোকসান হলেই বা কী? শুধু হেসে বলে, "এই যাঃ, এবারকার লেন-দেনটা দেখছি ভালো হলো না।"

সত্যি, ব্যবসায়ে মন ছিল না তার। একবার সে কোনো এক গ্রামে গেল অনেক চাল কিনতে। কিন্তু সিদ্ধার্থ সেখানে পৌঁছবার আগেই অন্য এক বণিক সব চাল কিনে ফেলেছে। তবু সিদ্ধার্থ কয়েকদিন থেকে গেল সে গ্রামে। সিদ্ধার্থ

কৃষকদের ডেকে এনে ভোজ দিল, গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পয়সা বিতরণ করল, একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ খেল, তারপর বেশ খুসী মনে নগরে ফিরে এলো। কামস্বামী তিরস্কার করল কেন সে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসেনি ; চাল কেনা হবে না জেনেও কেন মিছামিছি গ্রামে বসে থেকে সে অর্থ ও সময়ের অপব্যয় করেছ ? সিদ্ধার্থ উত্তর দিল "বন্ধু, তিরস্কার করো না, তিরস্কারের দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না। যে লোকসান হয়েছে তার দায় আমি একাই বহন করব। এবারকার ভ্রমণটা বেশ ভালো লেগেছে আমার। কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো ; একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল ; গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আপনার লোক মনে করে আমার কোলে এসে বসত ; কৃষকরা তাদের ফসলপূর্ণ জমি ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে আমাকে। কেউ আমাকে ব্যবসায়ী মনে করে দূরে সরিয়ে রাখেনি।"

একটু বিরক্ত হয়ে কামস্বামী বলল, "খুব ভালো কথা ; কিন্তু তুমি যে বণিক সে কথা তো অস্বীকার করতে পার না ? ব্যবসার জন্য বেরিয়েছিলে না প্রমোদ ভ্রমণ ছিল তোমার উদ্দেশ্য ?

—"নিশ্চয়ই আনন্দের জন্য ভ্রমণ করেছি," সিদ্ধার্থ হেসে বলল। "কেন নয় ? আমি নতুন অঞ্চল দেখবার সুযোগ পেলাম, কত নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো, তাদের বন্ধুত্ব

লাভ করেছি, তারা আমাকে আপনার লোক বলে গ্রহণ করেছে। আর আমি কামস্বামী হলে চাল কিনতে না পারার দুঃখে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসতাম, এবং সময় ও অর্থ সত্যি হারিয়ে যেত। কিন্তু আমি কয়েকটা দিন আনন্দে কাটিয়ে এসেছি, শিখেছি অনেক কিছু। কত আনন্দ পেয়েছি; কিন্তু ব্যর্থতার ক্ষোভে কিংবা অশোভন ব্যস্ততার জন্য নিজেকে অথবা অন্য কাউকে দুঃখ দিইনি। হয়তো পরবর্তী ফসলের চাল কিনতে কিংবা অন্য কোনো কারণে আবার সেখানে গেলে বন্ধুদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করব। তখন আমি এই ভেবে তৃপ্তি লাভ করব যে প্রথমবার এসে ব্যস্ততা ও অসন্তোষ প্রকাশ করিনি। যাই হোক, এ ব্যাপারের আলোচনা এখানেই শেষ হয়ে যাক; আমাকে তিরস্কার করতে গিয়ে তুমি দুঃখ পেও না। এমন দিন যদি আসে যখন তোমার মনে হবে, সিদ্ধার্থ আমার ক্ষতি করছে, তখন শুধু সেই কথাটি আমাকে জানিয়ে দিও; আমি আমার পথে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু সে দিন না আসা পর্যন্ত আমাদের অন্তরঙ্গতায় যেন ছেদ না পড়ে।"

শ্রেষ্ঠী কিছুতেই সিদ্ধার্থকে বোঝাতে পারত না যে সে কামস্বামীর ভাত খাচ্ছে। সিদ্ধার্থ বলে সে নিজেরটাই খায়; তারা দু'জনেই অপরের অন্নে ভাগ বসায়, প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাগ গ্রহণ করে। কামস্বামীর ঝনঝাটের শেষ ছিল না,

কিন্তু সিদ্ধার্থ কখনো নিজেকে তার সঙ্গে জড়াত না। একটি লেন-দেন ব্যর্থ হবার আশঙ্কা দেখা দিলে, মালের একটা চালান হারিয়ে গেলে, দেনাদার ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ দেখলে ক্রুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করে, কপালের বলি-রেখা স্পষ্ট করে, রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে যে ফল পাওয়া যায় কামস্বামী সিদ্ধার্থকে তা কিছুতেই বোঝাতে পারেনি। সে কামস্বামীর কাছ থেকেই সব-কিছু শিখেছে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "এমন পরিহাস কোরো না। তোমার কাছ থেকে শিখেছি এক ঝুড়ি মাছের দাম কত, টাকা ধার দিলে সুদের হার কত হবে,—এই সব। তোমার বিদ্যা তো এই। কিন্তু বন্ধু, কি করে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয় তা তোমার কাছ থেকে শিখিনি। এই বিদ্যাটা তুমি আমার কাছ থেকে শিখে নিলে ভালো করতে।"

সত্যি ব্যবসায়ে তার মন ছিল না। কমলার জন্য টাকা প্রয়োজন, তাই সে আছে এই কাজে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা আসে তার হাতে। তা ছাড়া সংসারের এই বিচিত্র জনতা সম্বন্ধে সিদ্ধার্থের ছিল সহানুভূতি ও কৌতূহল। এতদিন এদের জীবনযাত্রা, আনন্দ বেদনা, দোষত্রুটি তার কাছে আকাশের চাঁদের চেয়েও দূরের বস্তু ছিল। যদিও সকলের সঙ্গেই সে অতি সহজে আলাপ করতে পারে, বাস করতে পারে, তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন কথা শিখতে পারে, তবু

সম্পূর্ণ মিলন ঘটে না, কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়। সিদ্ধার্থ বুঝতে পারে সন্ন্যাস জীবনের অভিজ্ঞতাই এর কারণ। সে দেখে, লোক কখনো শিশুর মতো কখনো বা পশুর মতো আচরণ করছে। সিদ্ধার্থ তাদের ভালোবাসে, আবার ঘৃণা করে। সে দেখে তারা কঠোর পরিশ্রম করছে ; অর্থ, তুচ্ছ সুখ, তুচ্ছ সম্মান লাভের জন্য কত দুঃখ ভোগ করে, বার্ধক্যে নুয়ে পড়ে ; অথচ এসব আকাঙ্ক্ষার বস্তু সিদ্ধার্থের চোখে মূল্যহীন। সিদ্ধার্থ দেখে তারা পরস্পরকে গালি দেয়, আঘাত করে ; সংসারী লোক যেসব বেদনায় বিলাপ করে সন্ন্যাসীরা তা হেসে উড়িয়ে দেয় ; সিদ্ধার্থ লক্ষ্য করে যে পাপের ফলে এরা ক্লেশ ভোগ করে সন্ন্যাসীদের তা স্পর্শও করতে পারে না।

সিদ্ধার্থের নিকট সকল লোকের ছিল অবারিত দ্বার। যে বণিক বস্ত্র বিক্রয় করতে আসত, যে দেনাদার ঋণ প্রার্থী হয়ে আসত, তাদের সমানভাবেই সে অভ্যর্থনা করত। আবার ভিক্ষুককেও সে কাছে ডেকে বসাত, এক ঘণ্টা ধরে তার দারিদ্র্যের কাহিনী শুনত ; অথচ ভিক্ষুকও সন্ন্যাসীদের মতো নিঃস্ব নয়। যে নাপিত তার দাড়ি কামায়, যে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কলা কেনে এবং যাকে জেনেশুনেই দু'এক পয়সা ঠকাতে দেয়, এবং যে বিত্তশালী বিদেশী শ্রেষ্ঠী ব্যবসায় উপলক্ষে অতিথি হয়ে আসে—প্রত্যেকের সঙ্গেই সিদ্ধার্থ সমান ব্যবহার করে। কামস্বামী যখন তার দুঃখের কথা বলতে আসে, যখন ব্যবসায়

সংক্রান্ত কাজের বিরূপ সমালোচনা করে তখনও সিদ্ধার্থ মন দিয়ে শোনে ; কামস্বামীর কথায় আশ্চর্য হয়ে যায়, তাকে বুঝতে চেষ্টা করে, যেখানে প্রয়োজন তার কথা একটু স্বীকার করে নেয় ; তারপরেই সে আলাপ শুরু করে অন্য কোনো একজন সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে। তার কাছে লোকও আসে অনেক—কেউ ব্যবসার জন্য, কেউ প্রতারণা করতে, কেউ তার কথা শুনতে, কেউ সহানুভূতি লাভ করতে, কেউ বা উপদেশ নিতে। সিদ্ধার্থ কাউকে উপদেশ দিত, কারো দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করত, কাউকে দিত উপহার, আবার তাকে একটু ঠকাবার সুযোগ করে দিত হয়তো কোনো কোনো লোককে ; একদিন দেবতা ও ব্রহ্ম তার মন যেমন অধিকার করেছিল তেমনি আজ মানুষ নিয়ে এই বিচিত্র খেলায় সিদ্ধার্থ ডুবে থাকে ; ভালো লাগে, নতুন লাগে এই খেলা।

কখনো কখনো সিদ্ধার্থ নিজের মধ্যে একটি মৃদু, কোমল স্বর শুনতে পায় ; কি যেন তাকে বড় আস্তে আস্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, কিসের বিরুদ্ধে যেন অভিযোগ করছে। কিন্তু এত মৃদু সেই স্বর যে প্রায় শোনা যায় না। হঠাৎ সে স্পষ্ট করে অর্থ উপলব্ধি করতে পারল ; যে জীবন সে যাপন করছে সে জীবন তার কাছে অচেনা ; কত কাজ করছে শুধু খেলার ছলে। প্রকৃত জীবনের ধারা বয়ে যাচ্ছে দূর দিয়ে,—তার ছোঁয়ার বাইরে। খেলোয়াড় যেমন বল নিয়ে খেলা করে

সিদ্ধার্থও তেমনি খেলা করছে ব্যবসা নিয়ে, চারপাশের লোকদের নিয়ে ; সে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে, আমোদ পায়, কিন্তু মন নেই এসবের মধ্যে ; তার প্রকৃত সত্তা নেই এখানে ; তার আত্মা, তার আসল সত্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য কোথাও,—অনেক দূরে ; অদৃশ্য হয়ে কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে, যোগ নেই বর্তমান জীবনের সঙ্গে। এই ভাবনা মাঝে মাঝে তাকে ভীত করেছে ; তার মনে হয়েছে এর চেয়ে ভালো হতো যদি জীবনের খেলায় শিশুর মতো সকল আগ্রহ নিয়ে মত্ত হয়ে যেতে পারত, যদি সংসারের কাজকর্মে সত্যি সত্যি আনন্দ লাভ করতে পারত। শুধু দর্শক না হয়ে যদি সংসারের আর পাঁচ জনের মতো জীবনকে উপভোগ করা সম্ভব হতো !

সিদ্ধার্থ নিয়মিতভাবে কমলার বাড়ী যায়। শিখেছে প্রেমের কলা ; দান-প্রতিদান যে-প্রেমে এক হয়ে মিশে যায় সেই প্রেমের বিদ্যা। সিদ্ধার্থ তার সঙ্গে গল্প করে, নতুন কথা শেখে, কমলাকে উপদেশ দেয়, গ্রহণ করে কমলার উপদেশ। একদিন গোবিন্দ তাকে যতটা বুঝতে পারত কমলা তার চেয়ে বেশি বুঝতে পারে। কমলা যেন অনেকটা তার নিজের মতো।

সিদ্ধার্থ একদিন বলল, "কমলা, তোমার মধ্যে দেখতে পাই আমার ছায়া ; তুমি আর কারো মতো নও ; তুমি শুধুই কমলা, তুমি অনন্যা। তোমার মনের এক কোণে আছে গভীর প্রশান্তি, আর আছে একটি মন্দির ; যখনই নিজেকে নিয়ে একটু একা

থাকতে চাও তখনই প্রবেশ কর সেই মন্দিরে ; ঠিক আমার মতো। খুব কম লোকেরই এই ক্ষমতা আছে, অথচ প্রত্যেকেই তা লাভ করতে পারে।"

কমলা বলল, "সকল লোকের বুদ্ধি তো সমান নয়।"

"বুদ্ধির সঙ্গে এর যোগ নেই, কমলা।" সিদ্ধার্থ উত্তর করল। "বুদ্ধিতে কামস্বামী আমার সমকক্ষ, কিন্তু তার মনের কোণে মন্দির নেই। আবার কত লোকের আছে যারা বুদ্ধিতে শিশুর মতো সরল। কমলা, অধিকাংশ লোকই ঝরা পাতার মতো হাওয়ায় উড়ে যায়, ভেসে ভেসে বেড়ায় কিছুক্ষণ, তারপর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে. কিন্তু অল্প কয়েকজন আছেন যাঁরা আকাশের নক্ষত্রের মতো নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলেন ; পৃথিবীর হাওয়া সেখানে পৌঁছে না, তাঁদের পথ এবং পথপ্রদর্শক আছে তাঁদেরই অন্তরে। আমি অনেক বিজ্ঞ লোক দেখেছি : তাঁদের সকলের মধ্যে একজন এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর কথা কখনো ভুলব না। তিনি মহাভিক্ষু গৌতম ; তিনি ঘুরে ঘুরে প্রচার করেছেন তাঁর ধর্মমত। প্রতিদিন হাজার হাজার তরুণ তাঁর উপদেশ শোনে, প্রতি ঘণ্টায় পালন করে তাঁর নির্দেশ ; কিন্তু এই তরুণরা তো ঝরা পাতার দল ; পথ চলবার জ্ঞান ও নির্দেশ নেই তাদের নিজেদের অন্তরে।"

কমলা তার চোখের উপর চোখ রেখে হাসল; বলল, "আবার তুমি তাঁর কথা বলছ। শ্রমণ জীবনের ভাবনা আবার তোমাকে পেয়ে বসেছে।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল না। শুরু হলো প্রেমের খেলা। কমলা যে ত্রিশ চল্লিশটি খেলা জানত তারই একটি। শিকারীর ধনুকের মতো, জাগুয়ারের মতো নমনীয় কমলার দেহ। তার কাছ থেকে যারা প্রেম সম্বন্ধে জানতে আসত তারা পেত অনেক আনন্দ, জেনে যেত অনেক গোপন কথা। দীর্ঘকাল সে সিদ্ধার্থের সঙ্গে খেলা করল, তাকে বাধা দিল, অভিভূত করল, জয় করল, আর সেই জয়ের আনন্দে উঠল উচ্ছলিত হয়ে। পরাজিত, অবসন্ন সিদ্ধার্থ পড়ে রইল কমলার পাশে।

কমলা ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল সিদ্ধার্থের ক্লান্ত মুখ। তারপর চিন্তিত স্বরে বলল, "তুমি আমার শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। এমন আর পাইনি কাউকে। তুমি সকলের চেয়ে বীর্যবান, তোমার দেহ ও মন দুই-ই নমনীয়। সিদ্ধার্থ, আমার বিদ্যা তুমি ভালো করেই শিখেছ। একদিন, যখন বয়স বাড়বে, তোমার ছেলে যেন আসে আমার কোলে। এত প্রেমের খেলা, তবু প্রিয়তম, তুমি শ্রমণই রয়ে গেছ। তুমি সত্যি আমাকে ভালবাস না—কাউকে ভালোবাস না। একি সত্যি নয়?"

"হয়তো সত্যি," শ্রান্ত কণ্ঠে সিদ্ধার্থ জবাব দিল। "আমি

তো তোমার মতোই। তুমিও কাউকে ভালোবাস না; যদি বাসতে, তাহ'লে প্রেমকে কলা হিসেবে কি করে অভ্যাস করা সম্ভব? হয়তো আমাদের মতো লোকেরা কখনো ভালবাসতে পারে না। সাধারণ লোকেরা পারে, সেটাই তাদের মন্ত্রগুপ্তি।"

সংসার

নিজে সংসারী না হয়েও দীর্ঘকাল সিদ্ধার্থ সংসারে বাস করেছে। কঠোর সন্ন্যাস জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভোঁতা করে ফেলেছিল, আবার বেঁচে উঠছে তারা। অর্থ, প্রেম, ক্ষমতা—এ জীবনে মানুষের যা একান্ত কাম্য, সবই সে উপভোগ করেছে। তবু অন্তরে সে এখনো সন্ন্যাসী। তীক্ষ্ণধী কমলা দেখতে পেয়েছে তার এই সন্ন্যাসীর রূপ। সিদ্ধার্থের জীবন চিন্তা, প্রতীক্ষা ও উপবাসের নীতি দিয়েই পরিচালিত হয়। চারপাশের সাধারণ লোক সিদ্ধার্থের চোখে এখনো অপরিচিত; এদের জীবনকে সে এখনো যেন ভালো করে বুঝতে পারে না। তার নিজের জীবনও বোধ হয় ঠিক তেমনি দুর্বোধ রয়ে গেছে ওদের কাছে।

বছরের পর বছর পার হয়ে গেল। স্বচ্ছন্দ জীবনের আরামে ডুবে থেকে সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল না কাল প্রবাহের গতি। এখন সে বিত্তশালী; নিজে বাড়ী করেছে, ইঙ্গিতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে অনুচরের দল। নগরের বাইরে নদীতীরে গড়ে তুলেছে নিজের মনোরম উদ্যান। লোকে পছন্দ করে তাকে;

অর্থের প্রয়োজন হলে কিংবা উপদেশ দরকার হলে তারা আসে সিদ্ধার্থের কাছে। কিন্তু একমাত্র কমলা ছাড়া তার অন্তরঙ্গ বন্ধু কেউ নেই।

প্রথম যৌবনে গৌতমের ধর্ম্মোপদেশ এবং গোবিন্দের বিচ্ছেদ-বেদনা তার মধ্যে যে মহান জাগরণ এনে দিয়েছিল, তার সেই সদা-জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা, সকল গুরু এবং প্রচলিত ধর্ম্মমত ত্যাগ করে নিজের পায়ে একাকী দাঁড়াবার সেই গর্ব, নিজের অন্তরে পরম ব্রহ্মের প্রকাশের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ,—সব ধীরে ধীরে শুধুই স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে, হয়ত বা একেবারেই ভুলে গেছে। ভগবৎ প্রেরণার যে উৎস সে সর্ব্বদা অনুভব করত, যে প্রেরণার সঙ্গীত তার অন্তর মুখরিত করে তুলত, আজ সে সঙ্গীতের অস্পষ্ট রেশ ভেসে আসে বহু দূর থেকে। গৌতম, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং তার পিতার কাছ থেকে সিদ্ধার্থ শিখেছে অনেক কথা; শিখেছে সংযমের উপকারিতা, জেনেছে ধ্যানের আনন্দ, উপলব্ধি করেছে অহং ও অবিনশ্বর আত্মার নিগূঢ় তত্ত্ব। এ সব শিক্ষার অনেক কিছু এখনো রয়েছে তার মধ্যে; আবার কিছু কিছু ডুবে গেছে সংসারের চাপে, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার ধুলায় ঢাকা পড়েছে। কুমারের চাকা যেমন একবার ঘুরিয়ে দিলে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে থাকে, ক্রমশঃ গতি কমে আসে, তারপর একেবারে থেমে যায়,—তেমনি সন্ন্যাসের চাকা, চিন্তার চাকা, বিচারের চাকা এখনো ঘুরছে সিদ্ধার্থের অন্তরে। কিন্তু

সে চাকার গতি শ্লথ, ঘুরছে থেমে থেমে, একেবারে স্থির হয়ে যাবার সময় এসেছে। মুমূর্ষু গাছের গুঁড়িতে আর্দ্রতা ঢুকে যেমন সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে, শক্ত কাঠ আস্তে আস্তে পচে উঠে, তেমনি কোন এক অলক্ষ্য ছিদ্রপথে সংসার ও জড়ত্ব প্রবেশ করেছে সিদ্ধার্থের অন্তরে; ধীরে ধীরে তার আত্মা ভারী হয়ে উঠেছে, শ্রান্ত হয়ে পড়ছে,—যেন ঘুম পেয়েছে। অপর পক্ষে তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি আরো তীব্র হয়েছে, শিখেছে অনেক নতুন জিনিস, অভিজ্ঞতা লাভ করেছে প্রচুর।

সিদ্ধার্থ ব্যবসা পরিচালনা করতে শিখেছে, লোকের উপর সে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, নারীসঙ্গ থেকে আনন্দ পায়। এখন সিদ্ধার্থ বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করে, ভৃত্যদের আদেশ করে, সুগন্ধি জলে স্নান করে। সুমিষ্ট ও সযত্ন-প্রস্তুত আহার্য খেতে শিখেছে; মাছ, মাংস ও নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য আজকাল খাদ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে; আর পান করে সুরা,—যে সুরা মধুর অবসাদ আনে, মনের উপর বুলিয়ে দেয় বিস্মরনের প্রলেপ। সিদ্ধার্থ দাবা ও পাশা খেলা শিখেছে; এখন সে যায় নাচের আসরে, পালকি চড়ে বেড়ায়, কোমল শয্যায় শুয়ে নিদ্রার সাধনা করে। তবু সিদ্ধার্থ নিজেকে সংসারের জন প্রবাহ থেকে পৃথক মনে করেছে, মনে মনে অনুভব করেছে তার স্থান এদের ঊর্ধে। সে এদের সর্ব্বদাই একটু অবহেলার চোখে দেখেছে;—শ্রমণরা যেমন অবজ্ঞা

করে সংসারী লোকদের। কামস্বামী যখন ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ে, যদি সে অপমানিত বোধ করে, ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে যদি বিচলিত হয়, তবে সিদ্ধার্থ কৌতুক অনুভব করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ও অলক্ষ্যে সেই বিদ্রূপ ও উচ্চমন্যতার ভাব হ্রাস পেল। ক্রমশঃ সম্পত্তি বাড়বার সঙ্গে সিদ্ধার্থ ও সাধারণ সংসারী লোকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লাভ করল ; কোনো কোনো ব্যাপারে তার চরিত্রেও দেখা দিল ছেলেমানুষী, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তারও আরম্ভ হলো দুর্ভাবনা। তবু সিদ্ধার্থ ঈর্ষা করত সাধারণ লোকদের ; যতই সে ওদের কাছে নেমে আসে তার ঈর্ষাও ততই বৃদ্ধি পায়। ওদের যা আছে সিদ্ধার্থের তা নেই ; সেটাই ঈর্ষার কারণ। এরা জীবনের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করে, এদের আনন্দ ও বেদনায় যে গভীরতা আছে, ভালবাসায় যে উৎকণ্ঠা ও মধুর আনন্দ আছে, সিদ্ধার্থের তা নেই। সংসারী লোকেরা নিজেদের ও সন্তান সন্ততিকে ভালোবাসে, ডুবে থাকে সেই ভালবাসায় ; অর্থ ও সম্মানের মোহ তাদের লুব্ধ করে, মুগ্ধ হয় ভবিষ্যতের রঙীন আশায়। কিন্তু হায়, সিদ্ধার্থ তাদের কাছ থেকে শিখতে পারেনি এই শিশু-সুলভ আনন্দ ও ভুলভ্রান্তির রহস্য ; শিখেছে এমন সব জিনিস যা সে ঘৃণা করে। কত রাত্রি স্ফূর্তিতে কাটিয়ে পরদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকে ; শ্রান্তিতে ও বিষাদে দেহ ও মন পূর্ণ হয়ে যায়। কামস্বামী তার ঝঞ্ঝাটের কাহিনী বলতে

এলে সিদ্ধার্থ বিরক্ত ও অধৈর্য হয়ে ওঠে। পাশা খেলায় হার হলে মাত্রাহীন উচ্চকণ্ঠে সে হাসতে আরম্ভ করে। এখনো সিদ্ধার্থের মুখে চোখে বুদ্ধির দীপ্তি ঝক্‌ঝক্ করছে ; এ দীপ্তি আর কারো নেই। কিন্তু সে হাসি বিরল। ক্রমশঃ সিদ্ধার্থের মুখভাব আর পাঁচজন ধনী ব্যক্তির মতোই হয়ে উঠল। তেমনি অসন্তোষ, অসুস্থতা, বিরক্তি, আলস্য ও প্রীতিহীনতা ফুটে উঠল তার মুখে। ধীরে ধীরে ধনী-সুলভ কি এক রোগ তার অন্তরেও অনুপ্রবেশ করল।

অবগুণ্ঠনের মতো, পাৎলা কুয়াশার পর্দ্দার মতো, শ্রান্তি আচ্ছন্ন করেছে সিদ্ধার্থকে। দিনে দিনে সেই গুণ্ঠন ঘন হয়, মাসে মাসে তা অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে, বৎসরের পর বৎসর আরও পুরু হতে থাকে। নতুন পোষাক যেমন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো হয়, তার উজ্জ্বল রঙ্ হারিয়ে যায়, দাগ লাগে, ভাঁজ পড়ে, মুড়ি ছিঁড়ে যায়, এখানে ওখানে সূতা ওঠে ;—তেমনি গোবিন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিদ্ধার্থ যে নতুন জীবন আরম্ভ করেছিল, তা আজ জীর্ণ হয়ে গেছে। হারিয়ে যাওয়া বছরগুলি এই জীবনের সকল রঙ ও চাকচিক্য একে একে নিয়ে গেছে চুরি করে, শুধু জমে উঠেছে মলিন দাগ। মনের এক গোপন কোণে ঘৃণা ও ভুল-ভাঙার বেদনা বুঝি উঠতে চায় মাথা চাড়া দিয়ে ; দু'এক সময় তা প্রকাশ হয়েও পড়ে, তবু সিদ্ধার্থ এসম্বন্ধে এখনো সচেতন নয়। সিদ্ধার্থ শুধু লক্ষ্য করেছে একদিন যে

আনন্দোৎফুল্ল, সুস্পষ্ট স্বর তার হৃদয় থেকে পথ নির্দেশ করেছে আজ সেই স্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সংসার দুই বাহু দিয়ে সিদ্ধার্থকে জড়িয়ে ধরেছে। সে আজ তুচ্ছ সুখ, লোভ ও আলস্যের হাতে বন্দী। যে অর্জনের স্পৃহাকে সে একদিন ঘৃণা করত নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ বলে, আজ সেই পাপও স্পর্শ করেছে তাকে। শেষ পর্যন্ত অর্থ ও সম্পত্তির ফাঁদে সে বাঁধা পড়েছে ; এরা আজ আর খেলা ও খেলনা নয়,—হয়ে উঠেছে বোঝা, শৃঙ্খল। পাশা খেলার সহায়তায় অর্থোপার্জনের নিম্নগামী আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলছে সিদ্ধার্থ। সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ যখন প্রথম এলো সংসারে তখন সে পাশা খেলেছে সাধারণ লোকের রীতি হিসেবে। খেলেছে শিথিল ভাবে, পেয়েছে হাল্কা আনন্দ। এখন পাশা খেলে টাকার লোভে ; অর্থের মোহে খেলায় ক্রমশঃ আগ্রহ বাড়ছে। সিদ্ধার্থ অজেয় খেলোয়াড়, বেপরোয়া এবং অধিক বাজি রাখে যে তার সঙ্গে পাশা খেলতে কেউ সাহস করে না। অন্তরের তাগিদে সে খেলতে বসত ; যে অর্থ তার উপর মোহ বিস্তার করেছে জুয়া খেলে সেই অর্থ উড়িয়ে দিতে গভীর তৃপ্তি পায় সিদ্ধার্থ। আর কোনো উপায়েই অর্থের উপর তার বিদ্রূপমিশ্রিত অবজ্ঞাকে এমন স্পষ্ট করে দেখাবার সুযোগ নেই। ব্যবসায়ীদের মেকি দেবতা এই অর্থকে সুযোগ পেলেই সে অপমান করে ; মোটা অঙ্কের বাজি ধরে ; টাকার উপর

লোভ দেখে নিজেকে ঘৃণা করে, বিদ্রূপের কুটিল হাসি ফুটে ওঠে। জিতেছে হাজার হাজার টাকা, ছড়িয়ে দিয়েছে হাজার হাজার ; অর্থ হেরেছে, মণিমুক্তা হেরেছে, হেরেছে তার বাগান বাড়ী ; আবার সব জিতেছে, জিতেছে আর একবার হারাবে বলে। সিদ্ধার্থের ভালো লাগত সেই উৎকণ্ঠা— যে তীব্র, ক্লেশকর উৎকণ্ঠা তাকে অভিভূত করে ফেলত পাশা খেলায় মোটা অঙ্কের বাজির অনিশ্চয়তায়। এই অনুভূতির অভিজ্ঞতা ভালোবাসত সিদ্ধার্থ ; তার পরিতৃপ্ত, কবোষ্ণ, বিস্বাদ জীবনে একমাত্র পাশা খেলা নিয়ে আসে উচ্ছলতা ; পণ রেখে খেলবার উৎকণ্ঠার মধ্যে এখনো কিছু সুখ পায়, পায় উত্তেজনা ; তাই বার বার সে ফিরিয়ে আনতে চায় জুয়াড়ীর উৎকণ্ঠা,—তাকে তীব্রতর করে তোলে, প্ররোচিত করে। খেলায় বড় রকম হার হলে সে আত্মনিয়োগ করে অর্থ উপার্জনের নতুন চেষ্টায়, ব্যগ্র হয়ে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে, খাতকদের উপর চাপ দেয় দেনা শোধ করবার জন্য ; আবার সে খেলতে চায়, তাই টাকার প্রয়োজন ; আবার সে টাকা উড়িয়ে দিতে চায়, দেখাতে চায় অর্থ সে কত ঘৃণা করে। আজকাল লোকসান হলে সিদ্ধার্থ অস্থির হয়ে পড়ে, দেনাদার ঋণ শোধ করতে শৈথিল্য করলে অধৈর্য হয়ে ওঠে, ভিক্ষুকের উপর আর দয়া নেই, দরিদ্রকে ধার দেবার অথবা কিছু দান করবার মনোবৃত্তি হারিয়ে গেছে। যে সিদ্ধার্থ একদিন দশ

সহস্র মুদ্রা পণ রেখে হাসতে হাসতে পাশার দান ফেলেছে, সে আজ ব্যবসায়ের ব্যাপারে রূঢ় ও নীচ হয়ে উঠেছে ; আর আশ্চর্য, কখনো কখনো রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে ধনরত্নের। সেই ঘৃণিত স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে চোখ পড়ে দেয়ালের আয়নায় ; কী বিশ্রী দেখায় তার মুখ ! বার্ধক্যের কুশ্রীতা ছায়া ফেলেছে' নিজের মুখের প্রতিবিম্ব লজ্জা ও ঘৃণায় তাকে অভিভূত করে ; ঐ ছায়া থেকে, নিজের কাছ থেকে, পালিয়ে যেতে চায় ; পালিয়ে যায় দ্যূতক্রীড়ায়, প্রবৃত্তির ঘূর্ণাবর্তে, সুরার নেশায় , কিন্তু সে পলায়ন কতক্ষণেরই বা ? আবার অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয়ের তাগিদ জেগে ওঠে তার মনে। এই নিরর্থক আকর্ষণ-বিকর্ষণের বৃত্ত সিদ্ধার্থের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করছে, দিনে দিনে সে বৃদ্ধ ও পীড়িত হয়ে উঠছে।

তারপর একদিন একটি স্বপ্ন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। কমলার মনোরম প্রমোদ উদ্যানে বিকেল বেলটা কাটাতে এসেছে। গাছের তলায় বসে কথা বলছে কমলার সঙ্গে। কমলার কণ্ঠস্বর গম্ভীর, প্রতিটি কথার পশ্চাতে শ্রান্তি ও বেদনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কমলা শুনতে চায় গৌতমের কথা ; কী স্বচ্ছ তাঁর দৃষ্টি, কী প্রশান্ত-মধুর তাঁর মুখ; তাঁর হাসিতে কী করুণা, তাঁর সকল কথায় ও কাজে কী গভীর শান্তি! কতবার শুনেছে সিদ্ধার্থের মুখে, তবু তৃপ্তি নেই, আরো শুনতে চায়। বহুক্ষণ ধরে সিদ্ধার্থ বলল বুদ্ধের কাহিনী ; কমলা

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, হয়তো শীগগীরই একদিন আমি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করব। এই প্রমোদ উদ্যান তাঁকে দান করে তাঁর উপদেশের শরণ নেব আমি।" কিন্তু পরমুহূর্তেই কমলা সিদ্ধার্থকে প্রলুব্ধ করল; প্রেমের খেলায় ব্যগ্র ও উত্তপ্ত আলিঙ্গনে বন্দী করল প্রেমাস্পদকে, আবেগের প্রচণ্ডতার সঙ্গে মিশে গেল তার চোখের জল: কমলা পলায়নপর আনন্দের শেষ মধুবিন্দু নিংড়ে নিতে চায়। মৃত্যু ও কামনা যে পরস্পরের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ তা আজকের মতো রহস্যময় ভাবে আর কখনো সিদ্ধার্থের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কমলার গা ঘেঁসে চুপ করে শুয়ে আছে; ঠিক তার চোখের নিচেই কমলার মুখ। সেই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সিদ্ধার্থ আজ এই প্রথম লক্ষ্য করল বিষাদের চিহ্ন; দেখল, কমলার চোখের নিচে ও ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম রেখা, অগভীর ভাঁজ দেখা দিয়েছে; এরা জীবনে শীতের আগমন ঘোষণা করেছে; বলছে, বার্ধক্য এলো ব'লে। সিদ্ধার্থ সবে চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে তার কালো চুলে দু'একটা শাদা চুল দেখা যায়। কমলার সুন্দর মুখের উপর পড়েছে ক্লান্তির ছাপ; যে পথের শেষে আনন্দ-মধুর লক্ষ্য নেই, সেই দীর্ঘ নিরানন্দ পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কমলা; বার্ধক্যের প্রথম পদক্ষেপ শ্রান্তির ছায়া ফেলেছে; আর সেই মুখে হয়তো ছায়া ফেলেছে একটি গোপন, অবচেতন ভয়, যে ভয়ের কথা এখনো

মুখে উচ্চারণ করা হয়নি ;—জীবনে শীত ঋতুর আবির্ভাবে ভয়, বার্ধক্যের ভয়, মৃত্যুর ভয়। সিদ্ধার্থ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে কমলার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করল। কী একটা অনির্দেশ্য ভয় ও বেদনায় তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বাড়ী ফিরে এসে সিদ্ধার্থ নর্তকী ও সুরা নিয়ে বসল। আসরের অন্য সকলের উপরে তার স্থান, এমনি একটা ভান করে সিদ্ধার্থ। কিন্তু এখন তার শ্রেষ্ঠত্ব আর নেই। একটু একটু করে অনেক সুরা পান করেছে ; মধ্য রাত্রি পার হবার পর এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল ঃ দেহ শ্রান্ত, কিন্তু মনের উত্তেজনা এখনো শান্ত হয়নি। নিদারুণ হতাশায় চোখে প্রায় জল আসার উপক্রম হয়েছে। নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে শুয়ে বৃথা নিদ্রার সাধনা করে। গভীর বেদনায় সিদ্ধার্থের হৃদয় পূর্ণ ; এই বেদনার ভার সে আর বহন করতে পারছে না। প্রবল বির্বমিষা তার দেহ মন পীড়িত করছে ; বিস্বাদ সুরা পান করলে, দীর্ঘকাল হাল্‌কা মধুর সঙ্গীত শুনলে, নর্তকীদের চটুল হাসি দেখে দেখে এবং তাদের কেশ ও বক্ষের তীব্র মধুর সুগন্ধির ঘ্রাণে যে বমনেচ্ছা জাগে আজ সংসার-জীবন তেমনি বিবমিষায় পীড়িত করেছে সিদ্ধার্থকে। শুধু সংসারের উপর নয়, অন্যের উপর নয়, বিরক্তি এসেছে নিজেরই উপরে। তার চুলের সুগন্ধি, মুখের সুরার গন্ধ, নিজের উপরে ঘৃণা জাগায়। ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসা দেহের চামড়ার উপর চোখ পড়লে ঘৃণায় শিউরে ওঠে সিদ্ধার্থ। মাত্রাহীন ভূরি-

ভোজনের পর বমি করতে পারলে যেমন অস্বস্তির লাঘব হয়, তেমনি এই বিক্ষুব্ধ মানুষটি কামনা করছে যদি সে এই একান্ত অর্থহীন জীবনের আমোদ-প্রমোদ ও আচার-পদ্ধতি প্রচণ্ড শক্তিতে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারত! প্রত্যূষে গৃহ-সংলগ্ন রাজপথে যখন দিনের কর্মচাঞ্চল্য জেগে উঠতে আরম্ভ হয়েছে তখন সিদ্ধার্থের চোখে তন্দ্রা নেমে এলো, কয়েকটি অর্ধচেতন মুহূর্ত নিয়ে এলো নিদ্রার সুমধুর সম্ভাবনা। সেই সঙ্কীর্ণ সময়ের নিদ্রাবেশের মধ্যে সিদ্ধার্থ স্বপ্ন দেখল।

কমলার একটি ছোট দুষ্প্রাপ্য গীতমুখর পাখী ছিল। আদর করে তাকে রাখত সোনার খাঁচায়। সিদ্ধার্থ এই পাখীটি সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখল। পাখীটি সকালে গান করত; একদিন গান শোনা গেল না, হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেছে; সিদ্ধার্থ অবাক হয়ে খাঁচার কাছে গিয়ে ভিতরে লক্ষ্য করে দেখল। পাখীটা মরে শক্ত হয়ে খাঁচার মধ্যে পড়ে আছে। খাঁচা খুলে পাখীটা বের করে মুহূর্তকাল হাতের উপরে রাখল, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সিদ্ধার্থের বুক ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল; ঐ মরা পাখীটার সঙ্গে সে যেন ধূলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তার জীবনের যা কিছু মহৎ ও মূল্যবান বস্তু।

স্বপ্ন ভাঙল, ঘুম থেকে জেগে উঠল সিদ্ধার্থ। একটা গভীর বেদনার অনুভূতি তার দেহ ও মন বিবশ করে ফেলেছে। আজ

মনে হলো জীবনটা কাটিয়ে দিল অর্থহীন, মূল্যহীন কাজে। জীবন শেষ হয়ে এলো, কিন্তু এমন কিছুই সে পেল না যা মূল্যবান, যা সঞ্চয় করে রাখবার যোগ্য। ডুবে-যাওয়া জাহাজের যাত্রীর মতো একাকী সে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে আছে।

বিষন্ন অন্তরে সিদ্ধার্থ তার প্রমোদ উদ্যানে প্রবেশ করে প্রবেশ-পথ বন্ধ করে দিল। ধীরে ধীরে সে এসে বসল আম গাছের তলায়। তার হৃদয়ে ধ্বনিত হচ্ছে বিভীষিকার অনুভূতি ও মৃত্যুর ভয়। চুপ করে বসে বসে তার মনে হলো সে মরে যাচ্ছে, ম্লান হয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারপর ক্রমে ক্রমে অসংলগ্ন ভাবনাগুলি সংহত করে সমগ্র জীবনের ইতিহাস মনে মনে উল্‌টে পাল্‌টে দেখল। সত্যিকার সুখী সে কখন হয়েছে? প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেছে কখন? জীবনে আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ অবশ্য করেছে কয়েকবার। শৈশবে সহপাঠীদের অপেক্ষা অনেক বেশি শিখে, পবিত্র মন্ত্র সুষ্ঠুরূপে উচ্চারণ করে, পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তর্কে পারদর্শিতা দেখিয়ে, যজ্ঞানুষ্ঠানে সাহায্য করে সিদ্ধার্থ যখন ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে প্রশংসা-বানী লাভ করত তখন সে আনন্দ অনুভব করেছে। তখন অন্তরে যেন কার আহ্বান শুনতে পেত: "তোমার সামনে পথ পড়ে আছে, এসেছে সেই পথে এগিয়ে যাবার নির্দেশ; তুমি দেবতার আশীর্বাদ লাভ করবে।" তারপরে যৌবনে যখন ঊর্ধ্বগামী লক্ষ্যের প্রেরণা তাকে অন্যান্য তত্ত্বানুসন্ধানীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য

এনে দিয়েছে, যখন সে ব্রাহ্মণদের ধর্মোপদেশ বুঝবার জন্য কঠোর সাধনা করেছে, যখন প্রত্যেক নবলব্ধ জ্ঞান নতুন তৃষ্ণা জাগিয়ে দিত, তখন সেই তৃষ্ণা ও সাধনার প্রচেষ্টার মধ্যে তার মনে হয়েছেঃ চলো, এগিয়ে চলো ; এই তো তোমার পথ। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সে এই বাণী শুনেছে ; আবার শুনেছে শ্রমণদের ত্যাগ করে বুদ্ধের নিকটে যাবার সময় ; জেতাবন ত্যাগ করে অজ্ঞাত জীবনের পথে যাত্রা শুরু করবার সময়ও শুনেছে অন্তরের এই বাণী। আজ কতদিন হয়ে গেল এগিয়ে যাবার বাণী স্তব্ধ হয়ে গেছে ; প্রাত্যহিক জীবনের ঊর্ধে উঠে পবিত্র আনন্দলাভ করবার সুযোগ কতদিন হয়নি! তার জীবনেব পথ কী নীরস ও মরুময়! কত দীর্ঘকাল সে কাটিয়েছে কোনো উচ্চাদর্শ ছাড়া ; মহৎ উল্লাস কতদিন তার জীবনে আসেনি! তুচ্ছ সুখ নিয়ে সে ভুলে ছিল, অথচ কখনো সত্যকার তৃপ্তি লাভ করেনি। একথা বুঝতে না পেরে দীর্ঘকাল সে আকাঙ্ক্ষা করেছে, চেস্টা করেছে, সংসারী লোকদের মতো হতে, এই শিশুদের মতো হতে ; তবু সে হতে পারেনি তাদের এক জন ; বরং ওদের অনুকরণ করতে গিয়ে তার জীবন আরো দরিদ্র, আরো দুঃখময় হয়ে উঠেছে ; কারণ তাদের আদর্শ সিদ্ধার্থের নয়, তাদের দুঃখও সিদ্ধার্থের দুঃখ নয়। কামস্বামীর জগৎ ও সেখানকার অধিবাসীরা সিদ্ধার্থের চোখে একটি দর্শন যোগ্য নৃত্যনাট্য অথবা প্রহসন। একমাত্র প্রিয়জন কমলা ;

সিদ্ধার্থের জীবনে শুধু কমলারই মূল্য ছিল ; কিন্তু এখনো কি সে মূল্য আছে ? এখনো কি তার কমলাকে প্রয়োজন, কমলাও কি চায় তাকে ? তারা দুজনেও কি একটা খেলা করছিল না,—যে খেলার শেষ নেই ? সেই খেলার জন্য কি বেঁচে থাকা প্রয়োজন ? না। এই খেলার নাম সংসার,—সন্তান-লাভের খেলা ; একবার, দু'বার, হয়তো দশবার ভালো লাগে এই খেলা—কিন্তু বার বার খেলবার মতো উপযোগিতা আছে এর ?

আজ এই মুহূর্তে সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল খেলা শেষ হয়েছে, আর সে খেলতে পারবে না এই খেলা। সিদ্ধার্থের দেহ থর থর করে কেঁপে উঠল ; কি যেন মরে গেল তার মধ্যে। সেই মৃত্যুর শেষ বিক্ষেপ সিদ্ধার্থকে নাড়া দিয়ে গেল।

সিদ্ধার্থ সারাদিন বসে রইল আম গাছের তলায়। বসে বসে ভাবতে লাগল তার পিতার কথা, গোবিন্দের কথা, গৌতমের কথা। এঁদের ত্যাগ করে সে চলে এসেছে শুধুই কি আর এক জন কামস্বামী হবার জন্য ? সন্ধ্যা হলো, অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, তবু সিদ্ধার্থ স্থির হয়ে বসে আছে। একবার মুখ তুলল, চোখে পড়ল আকাশের তারা। মনে মনে ভাবল : আমার আম গাছের নিচে আমার প্রমোদ উদ্যানে বসে আছি একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল তার মুখে। তার নিজের অধিকারে একটি আম গাছ এবং বাগান রাখা কি নির্বোধের

কাজ হয়নি? এর কি প্রয়োজন ছিল? এ কি সঙ্গত হয়েছে?

সম্পত্তি সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিরও মৃত্যু ঘটল। সিদ্ধার্থ উঠে বিদায় নিল আম গাছ ও প্রমোদ উদ্যানের কাছ থেকে। সারাদিন অনাহারে আছে, প্রচণ্ড ক্ষুধা জ্বলে উঠেছে; মনে পড়ে গেল তার গৃহের কথা, তার কক্ষ, তার শয্যা আর নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্যের লোভনীয় ছবি। আবার একটু শ্রান্ত হাসি দেখা দিল তার মুখে, সব সে ত্যাগ করেছে; বিদায় নিল গৃহ, শয্যা ও খাদ্যের কাছ থেকে।

সেই রাত্রিতেই সিদ্ধার্থ উদ্যান ও নগর ত্যাগ করে কোথায় চলে গেল, আর ফিরে এল না। কামস্বামী দীর্ঘ কাল ধরে তার সন্ধান করেছে: তার ধারণা হয়েছিল সিদ্ধার্থ দস্যু তস্করের হাতে পড়েছে। কিন্তু কমলা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেনি। কমলা একটুও বিস্মিত হয়নি সিদ্ধার্থের অদৃশ্য হবার সংবাদ শুনে। সে কি এই সংবাদেরই প্রতীক্ষা করছিল না এতদিন? সিদ্ধার্থ কি আসলে গৃহহীন, তীর্থযাত্রী, শ্রমণ নয়? শেষ সাক্ষাতের দিনটিতে কমলার এই কথাই বড় বেশি করে মনে পড়ছিল। শেষ মিলনের মুহূর্তে সিদ্ধার্থকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে সে বুকের মধ্যে টেনে এনেছিল; সিদ্ধার্থও তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিবশ করে ফেলেছিল সেদিন। আজ এই হারানোর বেদনার মধ্যেও মিলনের মধুর স্মৃতি আনন্দের রেশ বয়ে আনছে।

কমলা সিদ্ধার্থের নিখোঁজ হবার সংবাদ পেয়ে সর্বপ্রথম গেল গবাক্ষের কাছে, যেখানে সোনার খাঁচায় সে রেখেছিল একান্ত বিরল জাতের একটি ছোট গায়ক পাখী। খাঁচা খুলে পাখী ছেড়ে দিল। দূরের আকাশে বিলীয়মান পাখীটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল কমলা। সে দিন থেকেই কমলার গৃহ অভ্যাগতদের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল। (আরও কিছুদিন পরে কমলা আবিষ্কার করল শেষ মিলনের ফলে সিদ্ধার্থের সন্তান এসেছে তার গর্ভে।)

নদীতীরে

ঘুরতে ঘুরতে নগর থেকে বহু দূরে চলে এসেছে সিদ্ধার্থ; আবার প্রবেশ করেছে বনে; পথের অনিশ্চয়তা থাকলেও সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে,—আর ফিরে যাবে না। যে জীবনে এতদিন সে ডুবে ছিল তার আকর্ষণ শেষ হয়ে গেছে; আকণ্ঠ ভোজনের পর যেমন খাদ্যের লিপ্সা চলে যায়, খাদ্য দেখলে বমির ভাব জাগে, সংসার-জীবন সম্বন্ধেও সিদ্ধার্থের এসেছে সেই বিতৃষ্ণা। সঙ্গীতমুখর বিহঙ্গের মৃত্যু হয়েছে; যে পাখীর মৃত্যু সে স্বপ্ন দেখেছিল সে তার হৃদয়ের বিহঙ্গ। সংসারে সে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল; স্পঞ্জ যেমন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জল টেনে নেয়, তেমনি সিদ্ধার্থ চারিদিক থেকে মৃত্যু ও ঘৃণা শুষে নিয়েছে নিজের মধ্যে। আজ তাই অবসাদ, বিষাদ ও মৃত্যুর ছায়ায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে; সুখ ও শান্তি দিতে পারে।

সিদ্ধার্থ একান্ত ভাবে কামনা করে বিস্মৃতির, কামনা করে বিশ্রামের, আকাঙ্ক্ষা করে মৃত্যুর। হায়, আকাশ থেকে তার মাথায় যদি বাজ ভেঙ্গে পড়ত! ঝোপের আড়াল থেকে বাঘ

কেন ঝাঁপিয়ে পড়ে না তার উপর? যদি এমন কোনো সুরা, এমন কোনো বিষ থাকত যা বিস্মরণ এনে দিতে পারে, ভুলিয়ে দিতে পারে, আর এনে দিতে পারে সেই ঘুম, যে ঘুমের পরে জাগরণ নেই! এমন কোন নোংরামি আছে যা দিয়ে সে নিজেকে কলুষিত করেনি, এমন কি পাপ আছে যা থেকে সে মুক্ত, তার অন্তরে এমন কোনো কালিমা আছে যার জন্য সে নিজেই দায়ী নয়? এর পরেও কি বেঁচে থাকা সম্ভব? এখনো কি বার বার নিঃশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ, ক্ষুধাবোধ, খাওয়া, ঘুমানো এবং নারী-সঙ্গ সম্ভব? তার জীবনে সংসার চক্রের বিবর্তন কি শেষ হয়ে যায় নি?

বনের মধ্য দিয়ে যে বড় নদী বয়ে চলেছে তার তীরে এসে দাঁড়াল সিদ্ধার্থ। মনে পড়ল অনেক দিন আগে এক পাটনী তাকে নদী পার করে দিয়েছিল; তখনও সে যুবক, গৌতমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের পথ খুঁজতে বেরিয়েছে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে মনে দ্বিধা দেখা দিল। ক্লান্তি ও ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। আর পথ চলে লাভ কি, কোথায় যাবে, কি উদ্দেশ্যে? জীবনের এই অসংলগ্ন স্বপ্নকে দূর করে দেবার গভীর যাতনাময় আকাঙ্খা, বাসি মদ বমি করে ফেলবার প্রবল তাড়না, তিক্ত, ব্যথাক্লিষ্ট, জীবনের চিব সমাপ্তি ঘটানোর অভিপ্রায় ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই সিদ্ধার্থের নেই।

নদীর তীর ঘেঁসে একটা নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

সিদ্ধার্থ এই গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে নিচে নদীর সবুজ জল প্রবাহের দিকে চেয়ে রইল। জলের স্বচ্ছন্দ গতি দেখতে দেখতে হঠাৎ সিদ্ধার্থের ইচ্ছা হলো নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে, ঐ সবুজ জলে ডুবে যেতে। তার আত্মার ভয়ঙ্কর শূন্যতা যেন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে জলের শীতল শূন্যতায়। হ্যাঁ, এবার সিদ্ধার্থ সমাপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া তার জীবনের এই ব্যর্থ কাঠামোটা ধ্বংস করে দূরে নিক্ষেপ করা, দেবতাদের বিদ্রূপের পাত্র হওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। তার ঘৃণিত দেহকে ধ্বংস করবার জন্য সিদ্ধার্থ ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। নদীর বড় বড় মাছগুলি যদি তাকে খেয়ে ফেলত! সে কুকুরের মতো জীবন যাপন করছে, সে বিকৃত মস্তিষ্ক, অপব্যবহার করে করে সে আত্মাকে প্রাণহীণ জড় পদার্থে পরিণত করেছে, সুতরাং তার দূষিত ও গলিত দেহ খেয়ে ফেললে ক্ষতি কি? হায়, মাছ ও কুমীর যদি তার দেহ নিঃশেষ করে ফেলত, যদি কোন পিশাচ নখরাঘাতে এই দেহকে শত খণ্ড করতে পারত! তা হ'লে বুঝি সিদ্ধার্থের জ্বালা একটু কমত, প্রতিশোধ নেওয়া হতো নিজের উপর।

সিদ্ধার্থের বিকৃত মুখ ভঙ্গীতে ফুটে উঠল জীবনের উপর বিরক্তি, নিজের উপরে ঘৃণা। নদীর জলে প্রতিবিম্ব পড়ল সেই মুখের; প্রতিবিম্ব দেখে নতুন করে ঘৃণা জেগে উঠল, ছি ছি করে উঠল সিদ্ধার্থ, থুথু ছিটিয়ে দিল ছায়ার উপরে। এতক্ষণ দু'হাত

পিঠের দিকে নিয়ে গাছটা জড়িয়ে ধরে ছিল এখন হাত ছেড়ে দিল, এবার সোজাসোজি নদীতে পড়ে যেতে বাধা নেই, তারপর ডুবে যাবে। দুই চোখ বন্ধ করে সে নত হলো,—ঝুঁকে পড়ল মৃত্যুর অভিমুখে।

হঠাৎ অন্তরের এক সুদূর কোন থেকে, তার ক্লান্ত জীবনের স্তূপীকৃত জঞ্জালরাশির নিচ থেকে, একটি স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল। কান পেতে শুনল সিদ্ধার্থ। একটি মাত্র শব্দ, পদ্যাংশও বলা যেতে পারে ; কিছু না ভেবেই সিদ্ধার্থ অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল শব্দটি। ব্রাহ্মণদের সকল প্রাচীন প্রার্থনার মন্ত্র যে শব্দ দিয়ে আরম্ভ ও শেষ হয়, এ' সেই পবিত্র "ওম্," যার অর্থ "পূর্ণ ব্রহ্ম" অথবা "পূর্ণতা।" ওম্ শব্দ কানে প্রবেশ করতেই সিদ্ধার্থের ঘুমন্ত আত্মা সহসা জেগে উঠল, বুঝতে পারল কী নির্বুদ্ধিতার কাজ সে করতে যাচ্ছিল।

সিদ্ধার্থ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে ; এত অধঃপতন হয়েছে, এমন বিভ্রান্ত হয়েছে, এমন যুক্তিহীন হয়ে পড়েছে, যে সে মৃত্যু কামনা করছে, আত্মহত্যা করতে উৎসুক হয়ে উঠেছে। দেহ ধ্বংস করে শান্তি লাভ করবার ছেলেমানুষী পেয়ে বসেছে তাকে। এত যন্ত্রণা, এত হতাশা, এমন মোহভঙ্গও সিদ্ধার্থকে ততটা বিচলিত করতে পারেনি, তার চেতনায় ওম্ ধ্বনিত হয়ে যতটা করেছে। মুহূর্তের মধ্যে সে উপলব্ধি করল তার পাপ, তার দীনতা।

মনে মনে "ওম্" উচ্চারণ করল সিদ্ধার্থ ; সঙ্গে সঙ্গে সে সচেতন হয়ে উঠল ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, বুঝতে পারল জীবন অবিনাশী, প্রাণপ্রবাহ অশ্রান্ত ধারায় বয়ে চলেছে। বিস্মৃতির আবরণ দূর হয়ে গেল ; মনে পড়ল যা ভুলে গিয়েছিল, যা কিছু পবিত্র ও মহৎ—নতুন করে তাদের সঙ্গে পরিচয় হলো।

কিন্তু মুহূর্তের জন্য , অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ শিখার মতো ক্ষণকালের জন্য সিদ্ধার্থের অন্তর আলোকিত হয়ে উঠেছিল। তারপর গভীর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে সিদ্ধার্থ নারকেল গাছের গোড়ায় শুয়ে পড়ল। অস্পষ্টভাবে ওম্ উচ্চারণ করতে করতে গাছের শিকড়ের উপর মাথা রেখে গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল সিদ্ধার্থ।

প্রগাঢ়, স্বপ্নবিহীন নিদ্রা। দীর্ঘকাল এমন ঘুম তার হয়নি। অনেকক্ষণ পরে যখন ঘুম ভাঙল তখন তার মনে হলো যেন এর মধ্যে দশ বছর কেটে গেছে। নদীর মৃদু কুলু কুলু ধ্বনি শুনতে পায় শুয়ে শুয়ে, কোথায় আছে, কেন এসেছে এখানে,—হঠাৎ বুঝতে পারে না। উপর দিকে চেয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখতে পেয়ে প্রথম বিস্মিত হয়ে গেল। তারপর মনে পড়ল ; মনে পড়ল, কোথায় শুয়ে আছে, কি করে এসেছে এখানে। সিদ্ধার্থের ইচ্ছা হলো এমনি করে বহুক্ষণ শুয়ে থাকবে। এখন মনে হয় অতীত অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে, বহু দূরে চলে গেছে, একান্তরূপেই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

জাগরণের প্রথম মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল অতীত জীবনটা যেন বহুদিন পূর্বেকার কোনো বিশেষ একটা মূর্তিমান রূপ, বর্তমানে যে আত্মা তার মধ্যে বাস করছে সেই আত্মাই হয়তো পূর্ব জন্মে অন্য কোনো আকারে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সিদ্ধার্থ বেশ স্পষ্ট করেই বুঝতে পেরেছে তার অতীত জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে ; জীবনের উপর অসীম বিরক্তি এবং অসহ্য যাতনা তাকে প্ররোচিত করেছিল আত্মহত্যা করতে। কিন্তু-পবিত্র 'ওম্' উচ্চারণ করে এই নদীর তীরে, নারকেল গাছের ছায়ায়, সে আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছে। 'ওম্' উচ্চারণ করতে করতে সিদ্ধার্থ ঘুমিয়ে পড়েছিল, জেগে উঠেছে এক নতুন জগতে। সে 'ওম্' মন্ত্র মুখে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর একবার মৃদুস্বরে তা উচ্চারণ করল ; সে তো ঘুম নয়, যেন সুদীর্ঘ সুগম্ভীর ওম্ ধ্বনি, ওম-এর ধ্যান, 'ওম্'-এর মধ্যে প্রবেশ করা, ডুবে যাওয়া ; নামহীন, রূপহীন ব্রহ্মের নৈকট্য লাভ করা।

কী চমৎকার ঘুম ! নিদ্রা আর কখনো এমন সতেজ, নবীন ও নতুন করে তুলতে পারেনি সিদ্ধার্থকে। হয়তো সে সত্যি নদীর জলে ডুবে গিয়েছিল, হয়তো সত্যি তার মৃত্যু হয়েছিল ; আবার নতুন রূপে নবজন্ম হয়েছে। না, তা নয় ; এখন সে চিনতে পেরেছে ; চিনতে পেরেছে নিজের হাত পা ; যেখানে শুয়ে ছিল চিনেছে সেই জায়গা ; অন্তরবাসী আত্মাকে এবং স্বেচ্ছাচারী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সিদ্ধার্থকেও চিনতে পারল নতুন

করে। তবু ঠিক সেই সিদ্ধার্থ নয়, কোথায় যেন পরিবর্তন হয়েছে, নতুন রূপ পেয়েছে। আশ্চর্য ঘুম! তেমনি বিস্ময়কর, পরিপূর্ণ জাগরণ; জাগরণ নিয়ে এসেছে আনন্দ ও জিজ্ঞাসা।

সিদ্ধার্থ উঠে বসতেই দেখল তার সামনে মুণ্ডিত কেশ, পীত বসন পরিহিত এক ভিক্ষু ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। সিদ্ধার্থ ভালো করে চেয়ে দেখল; অনেক পরিবর্তন হয়েছে,—মাথায় চুল নেই, দাঁড়ি-গোঁফ কামানো; বেশি দেরী হলো না, চিনতে পারল গোবিন্দকে। যৌবনের বন্ধু তার সঙ্গ ত্যাগ করে বুদ্ধের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গোবিন্দেরও বয়স হয়েছে, তবু তার মুখে এখনো পাঠ করা যায় স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যগুলি—ঔৎসুক্য, আনুগত্য, জিজ্ঞাসা ও উৎকণ্ঠা। কিন্তু গোবিন্দ যখন তার দৃষ্টি অনুভব করে চোখ তুলে তাকাল তখন সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল সে তাকে চিনতে পারেনি। সিদ্ধার্থের ঘুম ভেঙেছে দেখে গোবিন্দ খুশি হলো। মনে হলো সে যেন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে সিদ্ধার্থের ঘুম ভাঙবার জন্য; —যদিও গোবিন্দ তাকে চিনতে পারেনি।

সিদ্ধার্থ বলল, "আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি এখানে কি করে এলে?"

গোবিন্দ উত্তর দিল, "বন থেকে বেরিয়ে এসে সাপ এবং হিংস্র পশু এখানে ঘুরে বেড়ায়; এমন স্থানে ঘুমানো উচিত হয়নি। আমি গৌতমের অগণিত শিষ্যদের একজন।

কয়েকজন ভিক্ষুর সঙ্গে বেরিয়েছি তীর্থ ভ্রমণে। এমন বিপদ-সঙ্কুল স্থানে আপনাকে ঘুমাতে দেখে প্রথম জাগাতে চেষ্টা করেছি ; কিন্তু দেখলাম নিদ্রা অত্যন্ত গভীর ; তাই দল ত্যাগ করে আপনার কাছে বসলাম। কিন্তু দেখছি, আপনাকে পাহারা দেবার জন্য বসে আমি নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ক্লান্তি আমাকে পরাস্ত করেছিল, তাই কর্তব্য পালনে ত্রুটি হয়েছে। যাক্ এখন তো আপনার ঘুম ভেঙেছে ; এবার আমি যাই, সঙ্গীদের গিয়ে তাড়াতাড়ি ধরতে হবে।"

"হে শ্রমণ, ঘুমের সময় পাহারা দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। গৌতমের শিষ্যদের হৃদয় করুণায় পূর্ণ। এবার তুমি তোমার কাজে যেতে পার।"

"আমি যাচ্ছি ; আপনার মঙ্গল হোক্।"

"শ্রমণ, তোমাকে ধন্যবাদ।"

গোবিন্দ নমস্কার করে বলল, "বিদায়।"

সিদ্ধার্থ বলল, "বিদায়, গোবিন্দ, বিদায়।"

ভিক্ষু থমকে দাঁড়াল। "মহাশয়, ক্ষমা করবেন ; আমার নাম আপনি কি করে জানলেন ?"

সিদ্ধার্থ হেসে উঠল।

"গোবিন্দ, পিতার গৃহে, বিদ্যালয়ে, যজ্ঞানুষ্ঠানে, সন্ন্যাসীদের সঙ্গী হিসেবে ও জেতাবনে তোমার পরিচয় পেয়েছি।"

"তুমি সিদ্ধার্থ !" —প্রায় চীৎকার করে উঠল গোবিন্দ।

"এখন চিনতে পারছি ; দেখা মাত্রই চিনতে পারিনি কেন তা বুঝতে পারছি না। আমার অভিবাদন গ্রহণ করো, সিদ্ধার্থ। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় অত্যন্ত সুখী হয়েছি।"

"এতদিন পরে তোমাকে দেখে আমিও সুখী হয়েছি। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তুমি বসে বসে পাহারা দিয়েছ। যদিও তার দরকার ছিল না, তবু আবার তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কোথায় চলেছ, বন্ধু ?"

"যাবার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সব সময় আমরা সর্বদা পথে পথে কাটাই। সর্বদাই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াই, সঙ্ঘের নিয়ম মেনে চলি ; গৌতমের ধর্মোপদেশ প্রচার করি, ভিক্ষা সংগ্রহ করে নতুন কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়ি। এই একই নিয়মে চলছে আমাদের জীবন। কিন্তু সিদ্ধার্থ, তুমি কোথায় চলেছ ?"

সিদ্ধার্থ বলল, "আমার অবস্থাও তোমার মতোই, বন্ধু। কোথায় চলেছি তা আমারও জানা নেই। পথে পথে ঘুরছি। বেরিয়েছি তীর্থ ভ্রমণে।"

গোবিন্দ বলল, "তুমি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছ একথা মেনে নিলাম। কিন্তু সিদ্ধার্থ, তোমাকে তো তীর্থযাত্রীর মতো দেখায় না। তোমার বেশ, পাদুকা, সুবাসিত কেশ ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য দেয়, সন্ন্যাসের নয়।"

"বন্ধু, তুমি বেশ ভালো করেই লক্ষ্য করেছ। তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে কিছুই এড়িয়ে যায় না। কিন্তু আমি তো বলিনি যে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। বলেছি আমি তীর্থযাত্রী, এবং একথা সত্য।"

গোবিন্দ আবার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছ; কিন্তু তীর্থযাত্রীর এমন বেশ, এমন পাদুকা, এমন সুগন্ধি কেশ তো দেখা যায় না। কত বছর যাবৎ তো পথে পথে ঘুরছি, এমন তীর্থকামী দেখতে পাইনি।"

"গোবিন্দ, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আজ তুমি এক অভিনব তীর্থযাত্রীর দেখা পেয়েছ। প্রিয় গোবিন্দ, মনে রেখো এই দৃশ্যজগৎ অনিত্য, তার চেয়ে অনেক বেশি অনিত্য বেশ ভূষা ও কেশবিন্যাসের রীতি। তুমি যথার্থ বলেছ। আমার বেশভূষা সত্যি ধনাঢ্য ব্যক্তির। আমার বহুমূল্য বস্ত্র ও পাদুকা দেখছ, তার কারণ আমি গৃহী ছিলাম।"

"সিদ্ধার্থ, এখন তুমি কি?"

"তা জানিনা; তুমি যতটুকু জান তার বেশি আমারও জানা নেই। শুধু জানি পথে বেরিয়েছি, আমি পথিক। একদিন ঐশ্বর্য ছিল, আজ নেই; কাল আমার কি হবে, তাও বলতে পারি না।"

"ঐশ্বর্য হারিয়েছ?"

"আমি ঐশ্বর্য হারিয়েছি, অথবা ঐশ্বর্যই আমাকে হারিয়েছে—তা ঠিক জানি না। গোবিন্দ, বাহ্য রূপের চাকা দ্রুত আবর্তিত

হয়। সেই ব্রাহ্মণ সিদ্ধার্থ, সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ, ধনী সিদ্ধার্থ আজ কোথায়? যা অনিত্য তার বড় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, গোবিন্দ। একথা তো তুমি জান।”

আশৈশব বন্ধু সিদ্ধার্থের মুখের দিকে বহুক্ষণ সংশয়াচ্ছন্ন চোখে চেয়ে রইল গোবিন্দ। তারপর প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের যে রীতিতে অভিবাদন করা কর্তব্য সেই রূপে সিদ্ধার্থকে অভিবাদন করে গোবিন্দ নিজের পথ ধরল।

হাসিমুখে সিদ্ধার্থ তার পথের দিকে চেয়ে রইল। এখনো সে ভালোবাসে গোবিন্দকে,—তার ব্যগ্র, বিশ্বস্ত বন্ধুত্বকে। সিদ্ধার্থের সত্তায় ওম্‌ অনুপ্রবেশ করে অপূর্ব ঘুম এনে দিয়েছিল; সেই ঘুম ভেঙ্গে নবজীবন লাভের আশ্চর্য মুহূর্তে কোনো লোক বা কোনো জিনিসকে ভালো না বেসে পারবে কি করে? সেই অদ্ভুত নিদ্রা ও ওম্‌ মন্ত্রের প্রভাব তাকে যাদু করেছে; এখন সে সব কিছু ভালোবাসে; চারিদিকে যা কিছুর উপর চোখ পড়ে তার প্রতি আনন্দোৎফুল্ল প্রেম উথলে উঠে। আগে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে এমন করে ভালোবাসতে পারেনি; হয়তো সে জন্যই তার জীবন দুঃখময় ছিল।

ক্রমশঃ দূরগামী ভিক্ষুর পথের দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইল সিদ্ধার্থ। নিদ্রা তাকে সতেজ করেছে, কিন্তু দু’দিন অনাহারে থাকবার ফলে প্রচণ্ড ক্ষুধা পীড়ন করছে। ক্ষুধার জ্বালা অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা কবে হারিয়ে গেছে। যন্ত্রণার মধ্যেও সে হেসে

উঠল, মনে পড়ল সেদিনের কথা। মনে পড়ল, কমলার কাছে তিনটি জিনিসের গর্ব করেছিল; তিনটি মহৎ ও অপরাজেয় গুণ,—উপবাস, প্রতীক্ষা ও ধ্যান। তখন এই তিনটি ছিল তার একমাত্র সম্পত্তি, তার শক্তি ও ক্ষমতা, তার সুদৃঢ় অবলম্বন। সিদ্ধার্থ যৌবনে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা এই তিনটি গুণই আয়ত্ত করতে পেরেছিল, আর কিছু শেখেনি। এখন সিদ্ধার্থ তাদের হারিয়েছে; উপবাস, প্রতীক্ষা ও গভীর চিন্তা করবার ক্ষমতা—এদের একটি গুণও তার নেই। এদের সে বিনিময় করেছে অতি তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী জিনিসের জন্য; বিনিময় করেছে ইন্দ্রিয়সুখের লালসায়, অর্থ ও ভোগবিলাসের মোহে। সিদ্ধার্থ অপরিচিত পথে ভ্রমণে বেরিয়েছিল; ভ্রমণ সমাপ্ত হবার পর দেখছে সে আর পাঁচ জন মানুষের মতো সাধারণ হয়ে পড়েছে।

সিদ্ধার্থ নিজের অবস্থা চিন্তা করতে লাগল। চিন্তা করাটা কঠিন হয়ে উঠেছে তার পক্ষে; ভাবতে ইচ্ছা করে না, তবু জোর করে ভাবছে।

তার মনে হলো, যা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী তা ঝরে পড়েছে আমার জীবন থেকে; আবার আমি এসে দাঁড়িয়েছি মুক্ত আকাশের নীচে,—যেমন করে দাঁড়াতাম শিশুকালে। কিছুই আমার নয়, আমি কিছু জানি না, আমার কিছু নেই, আমি কিছুই শিখিনি। কী অদ্ভুত মনে হয়! যখন যৌবন অতিক্রান্ত,

যখন আমার চুলগুলি দ্রুত সাদা হয়ে উঠছে, যখন দেহের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, তখন নিজেকে শিশুর মতো নতুন মনে হচ্ছে। আবার সিদ্ধার্থের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সত্যি, কী অদ্ভুত তার অদৃষ্ট! সে সন্ন্যাস ত্যাগ করে পশ্চাতে চলছিল; কিন্তু আবার ফিরে এসেছে শূন্য হাতে,—নগ্ন ও সংসারানভিজ্ঞ হয়ে। কিন্তু তার জন্য কোন ক্ষোভ নেই; বরং একটা প্রবল ইচ্ছা হয় হেসে ওঠবার; নিজের দুর্দশায় হাসতে ইচ্ছা হয়, এই নির্বোধ এবং আশ্চর্য পৃথিবীর মুখের উপর বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ে মারতে চায়।

সিদ্ধার্থ হেসে মনে মনে বলল, তোমার সবকিছু পশ্চাদ্‌গামী হয়েছে। এই কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ল নদীর স্রোতের উপর; দেখল নদী কুল্‌ কুল্‌ ধ্বনি করতে করতে পিছু টানে অবিশ্রাম বয়ে চলেছে। দেখে অত্যন্ত খুসি হলো; সানন্দ হাসি দিয়ে সম্ভাষণ জানাল নদীকে। এই নদীতেই না সে ডুবে মরতে চেয়েছিল? —সে যেন শত শত বৎসর পূর্বের কথা; অথবা শুধুই স্বপ্ন?

সিদ্ধার্থ ভাবছে, কী আশ্চর্য তার জীবন! কত নতুন, অজানা পথে ঘুরছে সে। বালক বয়সে আমি দেবতার অর্চনা ও যাগযজ্ঞ নিয়ে মগ্ন ছিলাম; যৌবন কেটে গেছে ধ্যান ও তপশ্চর্যায়। ব্রহ্মকে খুঁজে ফিরেছি। আত্মার মধ্যে শাশ্বতের প্রকাশকে পূজা করেছি। যৌবনে প্রায়শ্চিত্ত ও কঠোর জীবন

যাপন আমাকে আকৃষ্ট করেছে। গ্রীষ্মে ও শীতে বনে বনে ঘুরেছি। শিখেছি উপবাস করতে, জেনেছি দেহকে জয় করবার কৌশল। তারপর একদিন আবিষ্কার করলাম বুদ্ধের বাণী, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেই বাণী থেকে শিখেছি সংসার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান ; জেনেছি যে পৃথিবীর বৈচিত্র্যের অন্তরালে আছে গভীর ঐক্য ; এই অনুভূতি তখন রক্তের মতো আমার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হতো। কিন্তু তবু আমি বাধ্য হয়েছিলাম বুদ্ধ এবং তাঁর মহান উপদেশ ত্যাগ করতে। তারপর নগরে গিয়ে কমলার কাছে শিখলাম প্রেমের কলা আর কামস্বামীর কাছে ব্যবসায়। কত অর্থ সঞ্চয় করলাম, কত অর্থ দুহাতে উড়িয়ে দিলাম ; অভ্যাস হলো উপাদেয় খাদ্য খাবার, ইন্দ্রিয় উত্তেজিত করবার কৌশলও শিখে নিলাম। অনেক বছর এমনি করে কাটাবার ফলে বুদ্ধি হারিয়ে গেল, চিন্তার শক্তি আর রইল না, ভুলে গেলাম বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্যবোধকে। একি সত্য নয় যে ধীরে ধীরে অনেক ভ্রান্ত পথ ঘুরে ঘুরে আমি আবার শিশু হয়েছি, পরিণত বার্ধক্য থেকে শৈশবে ফিরে এসেছি? যে পারত ধ্যান করতে সে কি নেমে আসেনি সংসারের সাধারণ মানুষের মধ্যে? এ পথে ভালোই কেটেছে এবং দেখা গেল অন্তরবাসী সোনার পাখীটি এখনো মরেনি। কিন্তু কী পথই না গেছে! নতুন জীবন লাভ করবার জন্য কত নির্বুদ্ধিতা, পাপ, ভুল, বিরক্তি, দুঃখ ও মোহভঙ্গের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে!

হয়তো এটাই ঠিক, এমনি করেই হওয়া উচিত। আমার চোখ ও হৃদয় নবজীবনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কত হতাশার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, কতবার অন্তরের গভীর তলদেশে ডুবে গেছি; অনুকম্পা লাভের জন্য আত্মহত্যার কথা ভেবেছি; আবার 'ওম্' ধ্বনি শুনতে চেয়েছি এবং আকাঙ্ক্ষা করেছি, আর একবার যেন তেমনি গভীর ঘুম নেমে আসে, তাহ'লে জেগে উঠতে পারব সতেজ নবীনতায়। " নিজের মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করবার জন্য আর একবাব নির্বোধ হতে হয়েছে; নতুন করে বাঁচবার জন্য পাপ কার্যে লিপ্ত হতে হয়েছে। এখন আবার পথ আমাকে নিয়ে যাবে কোন দিকে? এ পথ চলেছে নির্বোধের মতো, সোজা চলে না, এগিয়ে যাচ্ছে বৃত্তাকারে, পেঁচানো পথ ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে। যে দিকেই যাক, এই পথ ধরেই এগিয়ে যাব।

সিদ্ধার্থ অনুভব করল তার অন্তরে গভীর আনন্দের জোয়ার জেগে উঠছে।

কোথা থেকে এলো এই আনন্দ? এই সুখানুভূতির কারণ কি? একি দীর্ঘ সুনিদ্রার ফল? অথবা ওম্ মন্ত্রের প্রভাবে আমার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল? কিংবা অতীতের বিষাক্ত জীবন থেকে এতদিন পরে মুক্ত হতে পেরেছি বলে, পালিয়ে এসে শিশুর মতো খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াতে পেরেছি বলে এই আনন্দ? হায়, এই পলায়ন, এই মুক্তি,— কী সুন্দর! যেখান থেকে পালিয়ে এলাম সেখানে ছিল

সুগন্ধি দ্রব্য, মশলা, বাহুল্য ও জড়ত্বের আবহাওয়া। ঐশ্বর্যকে ঘৃণা করতাম, তাই দু'হাতে টাকা উড়িয়ে দিয়েছি পানোৎসবে ও জুয়া খেলায়। সেই ভয়ঙ্কর আবহাওয়ায় এত দীর্ঘকাল পড়ে থাকবার জন্য নিজেকে ঘৃণা করেছি! নিজেকেই কত ঘৃণা করেছি, ব্যর্থ করেছি, বিষাক্ত ও ক্লিষ্ট করেছি; আর তার ফলে দিনে দিনে বৃদ্ধ ও কুশ্রী হয়ে উঠেছি। একদিন নির্বোধের মতো ভেবেছিলাম সিদ্ধার্থ খুব বুদ্ধিমান! সে ভুল আর করবে না। কিন্তু একটা ভালো কাজ করেছি, তার জন্য আনন্দ পাই, এবং নিজেকে প্রশংসাও করতে হয়,—সেই অর্থহীন শূন্য জীবন এবং আত্মাবমাননা শেষ করে দিয়েছি। তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, সিদ্ধার্থ; তুমি যে এতদিনের পঙ্কিল জীবন থেকে মুক্ত হয়ে এক মহৎ আদর্শ অনুসরণ করে এগিয়ে আসতে পেরেছ তা অভিনন্দনযোগ্য, মস্ত বড় একটা কাজ করেছ তুমি; সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তোমার অন্তর-বিহঙ্গ আবার গান গেয়ে উঠেছে, আর সে গান তুমি শুনতে পেয়েছ, সে গান অনুসরণ করে চলেছ নতুন জীবনের পথে।

সিদ্ধার্থ নিজেই নিজের প্রশংসা করল, মন ভরে উঠল আত্ম-তুষ্টিতে এবং কান পেতে কৌতুকের সঙ্গে শুনতে লাগল ক্ষুধার্ত, শূন্য পেটের গড় গড় শব্দ। সে এখন উপলব্ধি করছে অতীত জীবনে যত দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করেছে, যার আবর্তে পড়ে সে হতাশা ও মৃত্যুর মধ্যে ডুবতে বসেছিল, সেই দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে

অনেকটা মুক্তি লাভ করেছে। কিংবা হয়তো পেয়েছে সম্পূর্ণ মুক্তি। সিদ্ধার্থ আরো অনেকদিন কামস্বামীর সঙ্গে থাকতে পারত, অর্থ উপার্জন করে তু'হাতে উড়িয়ে দিতে পারত ; দেহের খাদ্য যোগান দিয়ে আত্মাকে উপবাসী রাখতে পারত ; হতাশার সেই চরম মুহূর্ত'টি যদি না আসত, নদীর জলে ডুবে মরতে উদ্যত হবার উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা যদি লাভ না করত তা'হলে, কে জানে, আরো কতকাল সেই নরম গদির নরকে ঘুমিয়ে কাটাতে হতো ! এই হতাশা ও চরম বিতৃষ্ণার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেও পরাজিত হয়নি সিদ্ধার্থ। অন্তর-বিহঙ্গ, আত্মার স্বচ্ছ উৎস এবং অন্তরবাসী স্বর এত আঘাত ও অবহেলা সত্ত্বেও বেঁচে আছে ; তাই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, বিষণ্ণতা দূর হয়ে হাসি ফুটেছে, এবং সাদা চুলের নিচে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তার মুখ।

সিদ্ধার্থ ভাবল, ব্যক্তিগতভাবে জীবনের সকল অভিজ্ঞতা লাভ করাই ভালো। শিশুকাল থেকে শুনে এসেছি পার্থিব সুখ এবং ঐশ্বর্য কল্যাণকর নয়। দীর্ঘকাল এই উপদেশ জ্ঞানের ঘরে সঞ্চিত ছিল ; কিন্তু এখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার সত্যতা উপলব্ধি করেছি। এখন শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়, বুঝতে পেরেছি চোখ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, উদরের জ্বালা দিয়ে। এমনি করে জানতে পেরে আমার মঙ্গলই হয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবল তার রূপান্তরের কথা ; কাম

পেতে শুনল তার অন্তর-বিহঙ্গের আনন্দমুখর সঙ্গীত। অন্তরের এই বিহঙ্গ যদি মরে যেত, তাহ'লে সিদ্ধার্থেরও কি মৃত্যু হতো? না, তার মধ্যে অন্য কিছু মরেছে, যার মৃত্যু দীর্ঘকাল সে কামনা করে এসেছে। তার উগ্র সন্ন্যাস ব্রত পালনের সময় তো এরই ধ্বংস সে চেয়েছে। সে কি তার ব্যক্তিসত্তা নয়? সেই ক্ষুদ্র, ভয়ংকর এবং গর্বিত ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বহু বৎসর ধরে সে সংগ্রাম করেছে, বার বার পরাজিত হয়েছে, তার সুখ ও শান্তি হরণ করে নিয়ে ভীত করে তুলেছে। আজ এই বনে, সুপ্রসন্ন নদীর তীরে, সেই ব্যক্তিসত্তারই কি মৃত্যু হলো না? এর মৃত্যু হয়েছে বলেই তো সিদ্ধার্থ আজ শিশুর মতো নব জীবনের সুখে চঞ্চল, ভয়হীন, আশায় ও আনন্দে পূর্ণ।

সিদ্ধার্থ যখন ব্রাহ্মণ ছিল, যখন তপস্বী ছিল, তখন ব্যক্তি সত্তার সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হতে পারেনি কেন তাও আজ সে উপলব্ধি করতে পারল। তার পুঁথিগত বিদ্যার আধিক্য অন্তরায় ছিল. মন্ত্র ও যাগযজ্ঞের বাহুল্য, দেহের অতিরিক্ত পীড়ন এবং মাত্রাহীন কঠোর পরিশ্রম উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। সে ছিল দাম্ভিক, সকলের চেয়ে চতুর, সকল ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যগ্র, সর্বদাই অন্যের অপেক্ষা এক পা এগিয়ে থাকত; সর্বদাই সে নিজেকে মনে করত বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, মনে করত পুরোহিত অথবা ঋষি ব'লে। তার অহং আশ্রয় নিয়েছিল এই দম্ভ, পৌরোহিত্য এবং বুদ্ধির অহংকারের মধ্যে।

সিদ্ধার্থ যখন উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অহংকে ধ্বংস করেছে বলে ভাবছে তখন অহং তার দম্ভ ও বুদ্ধিমত্তা আশ্রয় করে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এখন সিদ্ধার্থ তার ভুল বুঝতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে তার অন্তরের নির্দেশই সত্য : কোনো গুরুই তাকে মুক্তি এনে দিতে পারত না। এই জন্যই তাকে যেতে হয়েছিল সংসারজীবনের মধ্যে, ক্ষমতা, নারী ও অর্থ নিয়ে ভুলে ছিল। তার মধ্যকার পুরোহিত ও সন্ন্যাসীর সত্তা যতদিন না নিঃশেষে মরে গিয়েছিল ততদিন সেই কারণেই সিদ্ধার্থকে ব্যবসায়, পাশা খেলা, সুরা ও ঐশ্বর্য নিয়ে ভুলে থাকতে হয়েছে। সেই ভয়ংকর বছরগুলির মধ্য দিয়ে সে জন্যই তাকে যেতে হয়েছে, ভোগ করতে হয়েছে বিবমিষার যাতনা, ব্যর্থ ও শূন্য জীবনের উন্মাদনা থেকে শিক্ষা পেয়েছে, তিক্ত হতাশার পাত্র নিঃশেষে পান করতে হয়েছে; আমোদলিপ্সু সিদ্ধার্থ ও ধনী সিদ্ধার্থের মৃত্যুর জন্যই এই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। তার মৃত্যু হয়েছে, নিদ্রার পরে জেগে উঠেছে আর এক নতুন সিদ্ধার্থ। এই সিদ্ধার্থও একদিন বৃদ্ধ হবে, শেষে মৃত্যু হবে। সিদ্ধার্থ অনিত্য,—সকল বাহ্যিক আকৃতিই অনিত্য। কিন্তু আজ সে নবীন, এই নতুন সিদ্ধার্থ আজ শিশু, অত্যন্ত সুখী।

সিদ্ধার্থ বসে বসে এসব কথা ভাবছে। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো পেটে শব্দ হচ্ছে,—সিদ্ধার্থের মুখে হাসি ফুটে উঠল ক্ষুধার

আহ্বান শুনে। সানন্দে সে নদীর প্রবহমান জলধারা দেখতে লাগল। আর কোনো নদী এর আগে তাকে এমন করে আকৃষ্ট করেনি। জলের বয়ে চলার দৃশ্য এবং কুলু কুলু ধ্বনি যে এত সুন্দর তা সিদ্ধার্থের জানা ছিল না। তার মনে হলো নদীর যেন তার জন্য বিশেষ কোনো বাণী আছে, যা সে জানে না, যা তাকে নতুন করে শিখতে হবে। এই নদীর জলে সিদ্ধার্থ ডুবে মরতে চেয়েছিল; বৃদ্ধ, শ্রান্ত, হতাশাক্লিষ্ট সিদ্ধার্থ আজ সত্যি ডুবে মরেছে এই নদীতে। এই জলপ্রবাহ তাকে গভীর প্রেমে বন্দী করেছে; মনে মনে সে স্থির করল শীগগীর সে এই নদীকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

পাটনী

সিদ্ধার্থ ভাবল, এই নদীর তীরেই থাকব আমি। নগরে যাবার পথে এই নদী পার হয়েছিলাম। একজন হিতৈষী পাটনী নদী পার করিয়ে দিয়েছিল। আমি আবার তার কাছে যাব। একদিন তার কুটীর থেকেই নতুন জীবনের পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম : সে জীবন জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়েছে। আমার বর্তমান পথ,—আর একটি নতুন জীবন, আরম্ভ হোক সেই কুটীর থেকে।

নদীর স্বচ্ছ সবুজ প্রবহমান জলধারার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সিদ্ধার্থ। স্ফটিকের রেখা দিয়ে তৈরী কত অপূর্ব নক্সা ভেসে চলেছে নদীর বুকের উপরে! সিদ্ধার্থ দেখছে কত উজ্জ্বল মুক্তা নদীর তলদেশ থেকে উপরে ভেসে উঠছে, কাচের মতো নদীর উপর দিয়ে বুদ্বুদ ভেসে চলেছে, সেই বুদ্বুদে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে আকাশের নীলিমা। সবুজ, সাদা, স্ফটিকস্বচ্ছ এবং আসমানী রঙের সহস্র চক্ষু মেলে নদী সিদ্ধার্থকে দেখছে। সে কত ভালবাসে এই নদীকে, কেমন করে মুগ্ধ করেছে তাকে এই নদী, কত কৃতজ্ঞ সে এই নদীর কাছে!

তার নবজাগ্রত অন্তর-বিহঙ্গের স্বর শুনতে পেল : "এই নদীকে ভালোবাসো, এর কাছে থাকো, নদীর নিকটে শিক্ষালাভ করো।" হ্যাঁ, নদীর কাছ থেকে সে শিখতে চায়, শুনতে চায় নদীর কথা। সিদ্ধার্থের মনে হলো যে নদীকে বুঝবে, তার রহস্যের কথা জানবে, সে বৃহত্তর উপলব্ধির ক্ষমতা লাভ করবে, জানতে পারবে অনেক গোপন রহস্য,—হয়তো বা সকল রহস্য।

আজ সিদ্ধার্থ নদীর একটি রহস্য শুধু দেখেছে, এবং সেই জ্ঞান তার অন্তরকে আবিষ্ট করেছে। সিদ্ধার্থ দেখছে জল নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কেবলই বয়ে চলেছে, তবু জল সর্বদাই বিদ্যমান, নদীর কোনো অংশই কখনো জলশূন্য হয়ে পড়ে না, সর্বদা জল রয়েছে, তবু প্রতি মুহূর্তে সে জল নতুন ; চির-প্রবহমান, চিরনতুন, চিরপূর্ণ এই নদী। কে ধারণা করবে, বুঝতে পারবে এই সত্য ? সিদ্ধার্থ এই রহস্য উপলব্ধি করতে পারেনি, তার জীবনের চিরপ্রবহমানতা রুদ্ধ হয়ে গেছে। অতীত ও বর্তমান জীবনের অখণ্ডতা নেই। অতীতের আছে শুধু অস্পষ্ট সন্দেহ, ঝাপ্সা স্মৃতি এবং দৈববাণীর রেশ!

সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়াল ; ক্ষুধার যাতনা অসহ্য হয়ে উঠেছে। নদীর কলধ্বনি এবং দেহাভ্যন্তরে ক্ষুধার আর্তনাদ শুনতে শুনতে অতি কষ্টে সে নদীতীর ধরে পথ চলতে লাগল।

খেয়াঘাটে পৌঁছে দেখল নৌকা বাঁধা আছে ; যে মাঝি একদিন তরুণ সন্ন্যাসীকে পার করে দিয়েছিল সে নৌকায় বসে আছে। অনেক বয়স হয়েছে পাটনীর, তবু সিদ্ধার্থ তাকে চিনতে পারল।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে পার করে দেবে ?"

একজন অভিজাত ব্যক্তি একাকী পায়ে হেঁটে এসেছে দেখে পাটনী বিস্মিত হলো ; আগন্তুককে তুলে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল।

"চমৎকার জীবন বেছে নিয়েছ তুমি," বলল সিদ্ধার্থ। "নদীর কাছে বাস করা, নদীর বুকে নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়ানোর মতো আনন্দ আর কি আছে ?"

বৈঠার টানে এক পাশে একটু কাৎ হয়ে মাঝি হাসল।

"সত্যি আমার জীবন সুন্দর। কিন্তু সব জীবন, সব কাজই কি সুন্দর নয় ?"

"হয়তো সুন্দর ; কিন্তু তোমার জীবনকে আমি ঈর্ষা করি।"

"কিন্তু হায়, এ জীবন দু'দিনেই আপনার কাছে বিস্বাদ হয়ে যাবে। এ জীবন সুবেশ ধনীর জন্য নয়।"

সিদ্ধার্থ হেসে উঠল। "আজ সবাই আমাকে পোষাক দিয়ে বিচার করেছে, পোষাকের জন্য সন্দেহের চোখে দেখছে। এই পোষাকের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি ; তুমি গ্রহণ করবে এগুলি ? তা ছাড়া ভাড়া দেবার পয়সাও আমার নেই।"

পাটনী হেসে বলল, "আপনি তামাসা করছেন।"

"না বন্ধু, আমি তামাসা করছি না। পূর্বেও তুমি একবার বিনা পয়সায় নদী পার করে দিয়েছ ; আজও পয়সার পরিবর্তে বহুমূল্য পরিচ্ছদ নিয়ে আমাকে পার করে দাও।"

"সব দিয়ে দিলে আপনার কি হবে ? আপনার কি পরিধেয় দরকার নেই ?"

"আমার অন্যত্র যাবার ইচ্ছা নেই। তোমার একখানা পুরানো কাপড় আমাকে দিও। আমি তোমার সহকারী কিংবা শিক্ষানবীস হয়ে থাকতে পারলে খুশী হবো। নৌকা চলবার কৌশল শিখতেই হবে আমাকে।"

পাটনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল অচেনা যাত্রীর মুখের দিকে। তারপর বলল, "আমি চিনেছি তোমাকে। তুমি একদিন আমার কুটিরে রাত কাটিয়েছ। সে অনেকদিনের কথা,—হয়তো বিশ বছর হবে। আমি তোমাকে নদী পার করে দিয়েছিলাম ; আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম বন্ধুর মতো। তখন তুমি সন্ন্যাসী ছিলে, নয় ? তোমার নাম আজ মনে করতে পারছি না।"

"আমার নাম সিদ্ধার্থ ; আমাকে পূর্বে যখন দেখেছ তখন আমি সন্ন্যাসী ছিলাম।"

"সিদ্ধার্থ, তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার নাম বাসুদেব। আজ তুমি আমার অতিথি। রাত্রিতে তুমি আমার

কুটিরেই থাকবে এবং আমাকে বলবে তোমার কাহিনী ; কোথা থেকে এসেছ, এবং কেনই বা মূল্যবান পরিচ্ছদের উপর বিতৃষ্ণা জেগেছে, সে কথা শুনতে চাই।"

মাঝ নদীতে এসে বাসুদেব জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগল। তীব্র স্রোত এখানে। কিন্তু তবু চাঞ্চল্য নেই বাসুদেবের। সে উল্টো দিকের গলুইয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সবল দুই বাহু দিয়ে প্রশান্ত চিত্তে দাঁড় টানছে। সিদ্ধার্থ চুপ করে বসে বসে বাসুদেবের দাঁড় টানা দেখতে লাগল ; মনে পড়ল, একদিন, সেই সন্ন্যাস জীবনে, এই লোকটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল। কৃতজ্ঞ চিত্তে সে গ্রহণ করল বাসুদেবের আমন্ত্রণ। তীরে পৌঁছে সে নৌকা বাঁধতে সাহায্য করল বাসুদেবকে। বাসুদেব সিদ্ধার্থকে নিয়ে এল তার কুটিরে ; জল আর রুটি দিল খেতে, বড় পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেল সিদ্ধার্থ। সবচেয়ে ভালো লাগল পাকা আম ; বাসুদেব কুড়িয়ে এনে তাকে খেতে দিয়েছে।

পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠেছে ; সূর্যাস্তের বিলম্ব নেই। সিদ্ধার্থ ও বাসুদেব নদীর ধারে একটা গাছের গুঁড়ির উপরে এসে বসল। সেই শান্ত পরিবেশে নদীকে সাক্ষী রেখে সিদ্ধার্থের আত্মকাহিনী অকপটে বলা সহজ হলো। তার জন্ম, পরিবার, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং হতাশা কিছুই সে গোপন করল না। সিদ্ধার্থের কথা শেষ হলো গভীর রাত্রিতে।

বাসুদেব নিবিষ্ট চিত্তে শুনল সিদ্ধার্থের কাহিনী। তার জন্ম, শৈশব, অধ্যয়ন, পথের সন্ধান, সুখ-সম্ভোগ এবং আকাঙ্ক্ষার কথা,—সব সে শুনল মন দিয়ে। অন্য লোকের কথা কি করে নীরবে আগ্রহের সহিত শুনতে হয় পাটনী সে কৌশল জানত। এইটে তার মস্ত বড় গুণ; এ গুণ খুব কম লোকেরই আছে। একটি কথাও সে বলে নি, তবু সিদ্ধার্থ অনুভব করেছে বাসুদেব যেন প্রত্যেকটি শব্দের জন্য নীরবে অপেক্ষা করে আছে, এবং উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রত্যাশিত শব্দটি তার অন্তরে প্রবেশ করছে, একটি কথাও সে হারিয়ে যেতে দেয় নি; বাসু-দেবের প্রতীক্ষার মধ্যে ধৈর্যহীনতা নেই, নেই নিন্দা কিংবা প্রশংসা; কান পেতে শুধু শুনেছে। সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল তার জীবনের মধ্যে, সংগ্রাম ও বেদনার মধ্যে, আবিষ্ট হয়ে যেতে পারে, ডুবে যেতে পারে, এমন শ্রোতা পাওয়া কী আশ্চর্যের কথা!

সিদ্ধার্থ শেষের দিকে যখন গভীর হতাশায় নদীর তীরে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়বার কথা, পবিত্র ওম্ ধ্বনির কথা এবং ঘুম থেকে জেগে নদীর প্রতি নতুন প্রেমানুভূতির কথা বলছিল বাসুদেব তখন চোখ বন্ধ করে দ্বিগুণ মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল সেই কাহিনী; সে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে গেল সিদ্ধার্থের আত্মচরিতের মধ্যে।

সিদ্ধার্থের কথা শেষ হলো; অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে

বাসুদেব বলল, "আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই ; নদী তোমার সঙ্গে কথা কয়েছে। নদী তোমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে, তাই তুমি তার কথা শুনতে পেয়েছ। বেশ, খুব ভালো কথা। সিদ্ধার্থ, তুমি আমারও বন্ধু ; এসো, আমার সঙ্গে থাক। একদা আমার স্ত্রী ছিল, তার শয্যা থাকত আমার শয্যার পাশে। অনেক দিন হলো সে মারা গেছে, বহুদিন যাবৎ আমি একা আছি। তুমি এসো, আমরা দু'জনে এক সঙ্গে থাকব। দু'জনের জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাব হবে না।"

"ধন্যবাদ," সিদ্ধার্থ বলল, "ধন্যবাদের সঙ্গে তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। বাসুদেব, এমন মন দিয়ে তুমি যে শুনেছ আমার কথা সে জন্যও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংসারে অতি অল্প লোকই আছে যারা জানে কি করে অপরের কথা শুনতে হয়, সত্যি তোমার মতো শ্রোতা আমি আর দেখিনি। এই গুণটিও তোমার কাছ থেকে আমাকে শিখতে হবে।"

"হ্যাঁ, শিখবে বৈকি!"—বল্‌ল বাসুদেব। "কিন্তু আমার কাছ থেকে নয়। নীরবে মন দিয়ে অন্যের কথা শোনবার বিদ্যা পেয়েছি নদীর কাছ থেকে ; তুমিও নদীর কাছ থেকে তা শিখবে। নদী সব জানে ; নদী সব তোমাকে শেখাতে পারে। এর মধ্যেই নদী তোমাকে শিখিয়েছে নিম্নাভিমুখী হয়ে গভীরতায় ডুবে যাওয়া ভালো। তাই ধনী ও যশস্বী সিদ্ধার্থ নৌকার দাঁড়ি হবে ; তাই সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণতনয় সিদ্ধার্থ পাটনী হতে

চলেছে। এ তো তুমি নদীর কাছ থেকেই শিখেছ। নদীর কাছ থেকে আর একটি জিনিসও তুমি শিখবে।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, "বাসুদেব, সে জিনিসটি কি?"

বাসুদেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "অনেক রাত হয়েছে, চলো এবার শুতে যাই। বন্ধু, সেই আর একটি জিনিস যে কি তা আমি বলতে পারি না। একদিন তুমি তা খুঁজে বের করবে, হয়তো বা এখনই জানো। আমি পণ্ডিত নই; কি করে ভেবে-চিন্তে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয় তা-ও জানা নেই। আমি জানি কি করে মন দিয়ে শুনতে হয় এবং ভক্তি করতে হয়; এ ছাড়া আর কিছুই শিখিনি। যদি বলবার এবং শেখবার ক্ষমতা থাকত তাহ'লে আচার্য হতে পারতাম; কিন্তু তা হতে পারিনি, হয়েছি শুধু খেয়া নৌকার মাঝি, যাত্রীদের নদী পার করে দিই। হাজার হাজার লোককে নদী পারাপার করে দিয়েছি; তাদের কাছে নদী শুধু পথের বাধা। সে সব পথিকদের কেউ অর্থের সন্ধানে, কেউ ব্যবসায়ের অভিপ্রায়ে, কেউ বিয়ের উদ্দেশ্যে, আবার কেউ বা তীর্থ-দর্শনের জন্য ভ্রমণে বেরিয়েছে; নদী তাদের ভ্রমণে বাধা সৃষ্টি করেছে; খেয়া নৌকার মাঝি সে বাধা দূর করতে তাদের তাড়াতাড়ি নদী পার করে দিয়েছে কিন্তু সেই হাজার হাজার পথিকের মধ্যে অল্প কয়েকজন—হয়তো চার পাঁচ জন—নদীকে পথের বাধা বলে মনে করেনি। নদীর

গোপন বাণী তারা শুনতে পেয়েছে, আমার মতো তারাও নদীর পবিত্র রূপটি দেখতে পেয়েছে। সিদ্ধার্থ, চলো এবার শুতে যাই।”

সিদ্ধার্থ পাটনীর সঙ্গে থেকে গেল। নৌকার তত্ত্বাবধান কি করে করতে হয় তা শিখে নিল সিদ্ধার্থ। খেয়াঘাটে যখন কাজ থাকে না তখন সে বাসুদেবের সঙ্গে যায় ধান ক্ষেতে, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, অথবা কলার কাঁদি কেটে আনে গাছ থেকে। সিদ্ধার্থ দাঁড় তৈরি করতে শিখল, শিখল নৌকার যত্ন নিতে এবং বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করতে। যা কিছু সে করে, যা কিছু সে শেখে, সবই তাকে আনন্দ দেয়; এবং দিন ও মাসগুলি লঘুপক্ষ পাখীর মতো দ্রুত উড়ে চলে যায়। বাসুদেব যা শিখিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সে শিখেছে নদীর কাছ থেকে। এই শেখার যেন ছেদ নেই, নদী সর্বদাই কিছু-না-কিছু শেখার সুযোগ এনে দেয়। সব চেয়ে বড় জিনিস নদী শিখিয়েছে শোনবার বিদ্যা। কি করে প্রশান্ত চিত্তে, ধৈর্য ধরে, মুক্ত অন্তরে শুনতে হয়, সেই কৌশল। শ্রোতার মনে ক্রোধ, কামনা ও মতামতের ছায়া পড়বে না।

বাসুদেবের সঙ্গে আনন্দেই দিন কাটছে সিদ্ধার্থের। তারা কেউ বড় একটা কথা বলেনা; প্রয়োজন হলে অল্প দু’ একটি সুচিন্তিত কথা বলে। বাসুদেব বাক্যবিলাসী নয়; তার মুখ থেকে কথা বের করতে সিদ্ধার্থ কদাচিৎ সক্ষম হয়।

একদিন সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, “সময় বলে যে কোন

জিনিস নেই এ গোপন তত্ত্বটাও কি তুমি নদীর কাছ থেকে শিখেছ ?”

উজ্জ্বল হাসিতে বাসুদেবের মুখ ভরে গেল। বলল, “হ্যাঁ, সিদ্ধার্থ। তুমি কি জানতে চাও ? তুমি বলতে চাও যে নদী সর্বত্র আছে ; সে আছে উৎপত্তি স্থলে, মোহনায়, জলপ্রপাতে, খেয়াঘাটে, স্রোত ধারায়, সমুদ্রে, পর্বতে, এবং সর্বত্র ; নদীর কাছে একমাত্র বর্তমানই সত্য ; অতীতের বা ভবিষ্যতের ছায়া পড়েনি তার বুকে ?”

“ঠিক তাই,” সিদ্ধার্থ বলল। “এ সত্য জানবার পর নিজের জীবন পর্যালোচনা করে দেখলাম আমার জীবনও নদীর মতো ; বালক সিদ্ধার্থ, পরিণত বয়স্ক সিদ্ধার্থ, বৃদ্ধ সিদ্ধার্থ শুধু ছায়ার পর্দা দিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ; আসলে কোনো পার্থক্য নেই, সব এক সূতায় গাঁথা। সিদ্ধার্থের পূর্ব জীবন অতীতে হারিয়ে যায়নি, তার মৃত্যু এবং ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনও ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে না। কিছুই অতীত হয়ে যায়নি, ভবিষ্যতের জন্যও কিছু অপেক্ষা করে নেই ; সব কিছুর অস্তিত্ব আছে এই বর্তমানে।”

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথা বলছে সিদ্ধার্থ। এই নতুন আবিষ্কার তাকে বড় আনন্দ দিয়েছে। তাহ'লে মানুষের সকল দুঃখ, ভয় এবং আত্মপীড়ন কি সময়ের জন্যই নয় ? সংসারের সকল পাপ ও বেদনাই কি জয় করা যায় না সময়কে পরাজিত

করলে ? অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সময়কে খণ্ডিত করবার মোহ থেকে মুক্তি পেলে ? আনন্দে উচ্ছল হয়ে কথা বলছে সিদ্ধার্থ, কিন্তু বাসুদেব একটি কথাও বলল না ; একবার শুধু হাসিসমুজ্জ্বল চোখে তার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর সিদ্ধার্থের কাঁধে মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল নিজের কাজে।

বর্ষাকালে নদী আবার ফুলে উঠল ; তার গর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করল, "নদীর গর্জনের মধ্যে বহু কণ্ঠের ধ্বনি মিলিত হয়েছে একথা কি সত্য নয়, বন্ধু ? এর মধ্যে কি রাজা, যোদ্ধা, ষাঁড়, নিশাচর পাখী, গর্ভবতী নারী, শোকার্ত মানুষ এবং এমনি হাজার হাজার প্রাণীর কণ্ঠস্বর মিলিত হয়নি ?"

বাসুদেব মাথা নেড়ে বলল, "সত্যি তাই ; নদীর স্বরের মধ্যে সকল প্রাণীর স্বর মিলিত হয়েছে।"

সিদ্ধার্থ আবার বলল, "নদীর লক্ষ লক্ষ স্বর একসঙ্গে যদি কেউ শুনতে পায় তাহ'লে নদী কোন্ শব্দটি উচ্চারণ করে তা কি জানো ?"

আনন্দে হেসে উঠল বাসুদেব। সিদ্ধার্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার কানে চুপি চুপি উচ্চারণ করল পবিত্র 'ওম্'। সিদ্ধার্থের কানেও ঠিক এই শব্দটিই ভেসে এসেছে নদীর হাজারো স্বর ছাপিয়ে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থের চেহারা ঠিক বাসুদেবের মতো হয়ে উঠতে লাগল। বাসুদেবের মতো সিদ্ধার্থের হাসিও আনন্দোজ্জ্বল, মুখের বলিরেখার খাঁজে খাঁজে সেই হাসির বিদ্যুৎধারা বয়ে যায়; তাদের দু'জনের হাসিই কখনো শিশুর মতো সরল, কখনো বা বার্ধক্যের ছায়ায় ম্লান। এই দু' মাঝিকে একত্র দেখে অনেক পথিক ধরে নিয়েছে তারা দু' ভাই। প্রায়ই দু' বন্ধু নদীতীরে গাছের গুঁড়ির উপর এসে বসত। নীরবে বসে বসে জলের কলধ্বনি শুনত; তাদের কাছে এটা শুধুই জলের গান নয়, এ হলো জীবনের স্বর, বিদ্যমানতার ঘোষণা, নিরন্তর রূপ পরিবর্তনের সরব ইঙ্গিত। প্রায়ই নদীর কথা চুপ করে শুনতে শুনতে দু'জনের মনে জেগে উঠত একই ভাবনা; হয়তো আগের দিনের কোনো আলোচনা, কোনো পথিকের কথা, মৃত্যুর চিন্তা, অথবা ছেলেবেলার স্মৃতি কেন্দ্র করে একই ভাবনা দু'জনের মনে একই সময়ে জেগে ওঠে। আবার কখনো নদী একই সময় দু'জনকে কোনো ভালো কথা বললে তারা পরস্পরের দিকে মুখ তুলে তাকায়, তাদের মনে থাকে একই চিন্তা, দু'জনের মনে একসঙ্গে যে প্রশ্নটি জেগেছে তার একটি উত্তর দু'জনকেই সন্তুষ্ট করে।

অনেক পথিক অনুভব করত খেয়া নৌকা এবং মাঝি দু'জনের মধ্য থেকে যেন কী একটা দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। কখনো কখনো এমন হয়েছে যে একজন যাত্রী হয়তো পাটনীর

মুখের দিকে একবার চেয়ে নিজের জীবনের কাহিনী বলতে আরম্ভ করেছে, বলেছে তার দুঃখের কথা, স্বীকার করেছে সকল দুষ্কৃতি, এবং তারপর প্রার্থনা করেছে সান্ত্বনা ও উপদেশ। কেউ কেউ হয়তো নদীর বানী শোনবার জন্য তাদের কুটীরে রাত কাটাবার অনুমতি প্রার্থনা করত। কখনো কখনো নানা বিচিত্র লোক এসে উপস্থিত হতো তাদের সম্বন্ধে জনশ্রুতি শুনে। খেয়াঘাটের দু'জন বিজ্ঞ ব্যক্তির কথা তারা শুনেছে; দেখতে এসেছে তারা যাদুকর, অথবা সত্যি পুণ্যাত্মা। কৌতূহলী পথিকরা নানা প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর পায়নি; কোথায় বা যাদুকর, কোথায় বা জ্ঞানী পুরুষ! তারা দেখা পেত দু'টি সহৃদয় বৃদ্ধের; মুখে কথা নেই, বোবা বলে সন্দেহ হয়; বিদেশী যাত্রীর চোখে তারা অস্বাভাবিক, হয়তো বা নির্বোধ। যারা জিজ্ঞাসু হয়ে এসেছে তারা হেসে বলে, এমন গুজব যারা ছড়ায় সে লোকগুলি কী বোকা, কী অন্ধ বিশ্বাস তাদের!

বছরের পর বছর পার হয়ে গেল, কেউ হিসেব রাখেনি। একদিন কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু খেয়াঘাটে এসে অনুরোধ করল নদী পারে করে দিতে। পাটনী তাদের মুখ থেকে শুনল ভগবান তথাগত অত্যন্ত পীড়িত, এই শেষবারের মতো নশ্বর দেহ ত্যাগ করে নির্বাণ লাভের মুহূর্ত আসন্ন; তাই ভিক্ষুরা দ্রুত ছুটে চলেছে তাঁর শয্যাপার্শ্বে। অল্প পরেই এলো আর এক দল ভিক্ষু; তারপর আর এক দল,—আরো এক দল;

ভিক্ষু ছাড়াও দলে দলে আসছে কত পথিক ; সকলের মুখে শুধু বুদ্ধের আসন্ন দেহত্যাগ ও নির্বাণের কথা। আর সব কথা তারা ভুলে গেছে। সামরিক অভিযানে যোগ দেবার জন্য যেমন চারদিক থেকে লোক ছুটে আসে, রাজার অভিষেক উৎসবে প্রজার দল যেভাবে রাজধানীতে মিছিল করে উপস্থিত হয়, তেমনি চুম্বকের আকর্ষণে মৌমাছির ঝাঁকের মতো পথিকের দল ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছে সেই তপোবনে, যেখানে বুদ্ধ মৃত্যু শয্যায় শায়িত ; সেখানে পৃথিবীর একটি মহৎ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে চলেছে ; সেখানে এ যুগের ত্রাণকর্তা চিরযুগে প্রবেশ করে অমরত্ব লাভ করবেন।

যাত্রীদের ব্যগ্রতা দেখে আজকাল সিদ্ধার্থের কেবলই মনে পড়ে মৃত্যুপথযাত্রী সেই মহর্ষির কথা, যাঁর কণ্ঠস্বর একদিন হাজার হাজার লোকের অন্তর সপ্লাবিত করেছে, যাঁর বাণী সে নিজেও শুনেছে এবং যাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে একদিন তার মন ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর কথা ভাবলেই মন অনুরাগে ভরে যায়, মনে পড়ে যায় তিনি মুক্তির কোন পথ নির্দেশ করেছেন ; আর, একদিন তারুণ্যের চপলতায় তাঁকে যেসব কথা বলেছিল তা মনে পড়লে আজ হাসি পায়। সে সব কথায় ঔদ্ধত্য ও অকালপক্কতার পরিচয় ছিল। যদিও তাঁর উপদেশ সে গ্রহণ করতে পারেনি তবু সেই সাক্ষাতের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সিদ্ধার্থ মনে মনে গৌতমের সঙ্গে অভিন্নতা

উপলব্ধি করেছে। যে প্রকৃত জিজ্ঞাসু, যে সত্যি কিছু পেতে চায়, সে কখনো অন্যের উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু যাঁর খোঁজা সার্থক হয়েছে, যিনি পথের সন্ধান পেয়েছেন, তিনি প্রত্যেক পথ, প্রত্যেক লক্ষ্য বিচার করে অনুমোদন করবার অধিকারী। হাজার হাজার সাধকের সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগ আছে, তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে থাকতে পারেন না।

বুদ্ধের আসন্ন দেহত্যাগের সংবাদ শুনে তাঁর দর্শন লাভের আশায় তীর্থযাত্রীর মতো হাজার হাজার লোক পথ চলছে। একদিন কমলাও এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। অপরূপ সুন্দরী বারাঙ্গনা তার পূর্ব জীবন ত্যাগ করেছে; সে তার উদ্যান দান করেছে গৌতমের শিষ্যদের সেবার জন্য; সে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। যেসব মহিলা তীর্থযাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখবার ব্রত গ্রহণ করেছে, কমলা এখন তাদেরই একজন। বুদ্ধের দেহত্যাগ সন্নিকট জেনে সামান্য একখানা শাড়ী পরে এবং ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে পথে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কমলা এসে পৌঁছেছে নদীতীরে। ছেলে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, বায়না ধরেছে বাড়ী ফিরে যাবার; সে চায় বিশ্রাম, চায় খাদ্য। প্রায়ই মুখ ফুলিয়ে বসে থাকে; কখনো বা কাঁদে। প্রায়ই ছেলেকে নিয়ে বসে থাকতে হয়। মায়ের নিষেধ না শুনে সে নিজের জিদ নিয়ে গোঁ ধরে। ছেলেকে খাওয়ানো, সান্ত্বনা দেওয়া এবং তিরস্কার করা কমলার

সারাদিনের কাজ। সে বুঝতে পারে না কেন তার মা কোন এক অজানা জায়গার উদ্দেশ্যে এই ক্লান্তিকর, দুঃখজনক তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কোন এক অপরিচিত পুণ্যাত্মা মরতে বসেছেন,—তাতে বালকের কি আসে যায়?

তীর্থযাত্রীরা বাসুদেবের খেয়াঘাটের নিকটে এসে পড়েছে। পুত্র বলল সে আর চলতে পারছে না, একটু বিশ্রাম করবে। কমলা নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ছেলে একটা কলা খেতে আরম্ভ করল; কমলা ছেলের পাশে মাটির উপরে শুয়ে পড়ল। শ্রান্তিতে তার চোখ বুঁজে এলো। অকস্মাৎ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল কমলা। বালক চমকে চেয়ে দেখল মা'র মুখ আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে। আর দেখতে পেল একটা ছোট কালো সাপ কমলার শাড়ীর ভাঁজ থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে ধীরে ধীরে চলে গেল।

সাহায্যের আশায় তারা দু'জনেই ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল নদীতীরে। একটু দূরেই খেয়াঘাট। কিন্তু কমলার চলবার শক্তি হারিয়ে গেছে, সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বালক মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে লাগল। বাসুদেব নৌকায় বসে ছিল, সে শুনতে পেল বালকের আর্তনাদ। বাসুদেব ছুটে এল; কমলাকে কোলে তুলে দ্রুত কুটিরে এসে পৌঁছল। বালক কাঁদতে কাঁদতে এসেছে তার পিছে পিছে। সিদ্ধার্থ তখন সবে মাত্র উনুনে আগুন দিয়েছে;

শব্দ পেয়ে মুখ তুলে চাইল। প্রথম চোখে পড়ল বালকের মুখ; এই মুখ মুহূর্তের মধ্যে তার মনে কী একটা অদ্ভুত আধ-চেনা স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। তারপর বাসুদেবের কোলে দেখতে পেল কমলার সংজ্ঞাহীন দেহ। কমলাকে চিনতে দেরী হলো না। বুঝতে পারল, এ বালক তারই ছেলে; তাই অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি তাকে হঠাৎ চঞ্চল করেছে। সিদ্ধার্থের হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত হলো।

কমলার ঘা সযত্নে ধুয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু বিষ এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে, শরীর কালো হয়ে উঠেছে। বলকারক ওষুধ দেওয়ায় কমলার সংজ্ঞা ফিরে এল। সিদ্ধার্থের শয্যায় শুয়ে আছে কমলা। যে সিদ্ধার্থ একদিন তার জীবন প্রেম দিয়ে পূর্ণ করেছিল সে আজ ব্যগ্র হয়ে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে। হঠাৎ কমলার মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে; তারপর পাংশু মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল; সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সিদ্ধার্থের দিকে। ধীরে ধীরে কমলা বুঝতে পারল তার অবস্থা, মনে পড়ল সাপের দংশন; উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলের নাম ধরে ডাকল।

সিদ্ধার্থ বলল, "ভেবো না, সে এখানেই আছে।"

কমলা আবার চোখ রাখল সিদ্ধার্থের চোখের উপর। সর্বাঙ্গে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, কথা বলতে কষ্ট হয়। আস্তে আস্তে বলল, "তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, প্রিয়তম। তোমার

মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু তবু একদিন ধূলিমলিন পায়ে কৌপীন মাত্র সম্বল করে যে তরুণ সন্ন্যাসী আমার বাগানে প্রবেশ করেছিল তোমার আজকের চেহারার সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল আছে। তুমি যখন কামস্বামী ও আমাকে ছেড়ে এলে তখনকার চেহারা মনে পড়ে না; তোমার দিকে চেয়ে ভেসে ওঠে সেই তরুণ সন্ন্যাসীর ছবি, যে একদিন প্রেমের পাঠ নিতে আমার কাছে গিয়েছিল। তোমার চোখ এখনো ঠিক তার মতোই আছে। হায়, আমিও বুড়ো হয়ে গেছি,—খুব বুড়ো; —আমাকে চিনতে পেরেছিলে?"

সিদ্ধার্থ হাসল; বলল, "তোমাকে দেখেই চিনেছি, কমলা।"

কমলা ছেলেকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ওকেও চিনেছ? —তোমার ছেলে।"

কমলার চোখ কি যেন খুঁজে বেড়াল কিছুক্ষণ, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। বালক কেঁদে উঠল। সিদ্ধার্থ তাকে কোলের উপর তুলে ধীরে ধীরে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল, কান্না থামাবার চেষ্টা করল না। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তার মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় শেখা একটি প্রার্থনার মন্ত্র। মৃদু স্বরে গানের মতো সে আবৃত্তি করতে লাগল, দূর অতীতের শৈশব থেকে মন্ত্রের শব্দগুলি স্মৃতিজড়িত হয়ে ভেসে আসছে। ছেলে একটু চুপ করল আবৃত্তি শুনে, তারপর কখন এক সময় ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘুমিয়ে পড়ল। সিদ্ধার্থ তাকে শুইয়ে

দিল বাসুদেবের বিছানায়। বাসুদেব উনুনে ভাত বসিয়েছে। সিদ্ধার্থ তার কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলল, "আর দেরী নেই।"

বাসুদেব নীরবে মাথা নাড়ল। উনুনের আলোয় তার স্নেহকোমল মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কমলা আর একবার সংজ্ঞা ফিরে পেল। তার বিবর্ণ মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সিদ্ধার্থ শান্ত চিত্তে সে চিহ্ন পাঠ করল; সেই বেদনার অংশভাগী হয়ে সে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। সিদ্ধার্থের ব্যগ্রতা অনুভব করতে কষ্ট হয় না কমলার। তার চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কমলা বলল, "এখন দেখছি তোমার সে চোখ আর নেই, যেন নতুন দৃষ্টি পেয়েছে। একেবারে নতুন হয়ে গেছে তোমার চাউনি। তোমাকে যে আজও সিদ্ধার্থ বলে চিনতে পারছি, সেটাই আশ্চর্য। তুমি সিদ্ধার্থ, অথচ যে আমার জীবনে এসেছিল ঠিক তার মতো নও।"

সিদ্ধার্থ কিছুই বলল না, নীরবে কমলার চোখের উপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

কমলা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি পেয়েছ? শান্তি লাভ করেছ?"

সিদ্ধার্থ এবারও কোন কথা বলল না, শুধু নীরবে তার হাত দিয়ে কমলার হাতের উপর একটু মৃদু চাপ দিল।

কমলা বলল, "হ্যাঁ, বুঝেছি। আমিও শীগ্‌গীর শান্তি লাভ করব।"

"তুমি তা পেয়েছ, কমলা," চুপি চুপি সিদ্ধার্থ বলল।

কমলা একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সিদ্ধার্থের দিকে। বুদ্ধকে দর্শন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সে পথে বেরিয়েছিল ; তাঁর মুখ-মণ্ডল থেকে যে শান্তির জ্যোতি বিকীর্ণ হয় ; তার সংস্পর্শে এসে শান্তি লাভ করবে এই ছিল কমলার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বুদ্ধের পাদস্পর্শ করা হলো না, দেখা পেল সিদ্ধার্থের। তবু এই ভালো ; বুদ্ধের দেখা পেলে যে তৃপ্তি লাভ করত, সিদ্ধার্থের দেখা পেয়েও তাই সে পেয়েছে। এ কথা সে বলতে চাইল সিদ্ধার্থকে, কিন্তু পারল না, জিভ্ গেছে আড়ষ্ট হয়ে। সে শুধু চুপ করে সিদ্ধার্থের মুখের দিকে চেয়ে রইল। সিদ্ধার্থ দেখল কমলার চোখ থেকে ধীরে ধীরে জীবনের জ্যোতি মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষ বার তার চোখ বেদনায় কালো হয়ে উঠল ; চরম যন্ত্রণায় তার দেহ শেষবারের মতো কেঁপে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ সন্তর্পণে আঙুল দিয়ে বিস্ফারিত চোখ দুটি বন্ধ করে দিল চিরদিনের জন্য।

অনেকক্ষণ ধরে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কমলার পাণ্ডুর মুখের দিকে। সেই শীর্ণ মুখ, কোঁকড়ানো ঠোঁটের দিকে চেয়ে চেয়ে সিদ্ধার্থের মনে পড়ে গেল তার জীবনের বসন্ত ঋতুতে সে এই ঠোঁট দুটিকে তুলনা করেছিল টাটকা কাটা ডুমুরের সঙ্গে।

অনেকক্ষণ ধরে কমলার বিবর্ণ মুখের ক্লান্ত বলিরেখার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সিদ্ধার্থ যেন নিজের পাণ্ডুর, মৃতমুখও দেখতে পেল। আজ কমলার যে অবস্থা একদিন তারও তেমনি হবে। আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল তাদের দু'জনের মুখ,—তারুণ্যে টলমল; রক্তিম অধর, কামনাদীপ্ত চোখ; সে দুটি মুখ অতীতে হারিয়ে যায়নি, তাদের অস্তিত্ব সে এখনো অনুভব করছে, এবং এই বিদ্যমানতার অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেলল। আজ মৃত্যুর সম্মুখে বসে সে উপলব্ধি করল কোনো জীবনেরই ধ্বংস নেই, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অমরত্ব লাভ করে, কিছুই হারায় না।

বাসুদেবের ভাত নেমেছে, কিন্তু কেউ তা স্পর্শ করল না। বাসুদেব এক কোণে খড় বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সিদ্ধার্থ কুটীরের বাইরে বসে সারা রাত কাটিয়ে দিল; নিস্তব্ধ রাত্রিতে নদীর কথা স্পষ্টতর হয়ে ভেসে আসছে তার কাছে। সিদ্ধার্থ অতীতের মধ্যে ডুবে গেল। শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য এবং জীবনের সবগুলি স্তর যুগপৎ তাকে ঘিরে ধরেছে, বিচলিত করেছে। মাঝে মাঝে সে উঠে এসেছে, দরজায় কান পেতে শুনেছে—ছেলে ঘুমিয়ে আছে, না কাঁদছে।

প্রত্যূষে, সূর্য ওঠবার আগে, বাসুদেব এসে দাঁড়াল বন্ধুর পাশে; বলল, "তুমি একটুও ঘুমোওনি?"

"না, বাসুদেব, আমি এখানে বসে বসে নদীর কথা শুনেছি।

নদী আমাকে অনেক কথা বলেছে, অনেক মহৎ ভাবনায় আমার মন পূর্ণ করেছে, দিয়েছে ঐক্যানুভূতির ঐশ্বর্য।”

“সিদ্ধার্থ, তুমি দুঃখ পেয়েছ, কিন্তু দেখছি সে দুঃখ অন্তরে প্রবেশ করে তোমার জীবনকে কালো করতে পারেনি।”

“না বন্ধু, তা পারেনি। কেন দুঃখ করব? একদিন আমার অর্থ ছিল, আমি সুখী ছিলাম। আজ আমি তার চেয়েও সুখী, তার চেয়েও ঐশ্বর্যশালী। আমার ছেলেকে পেয়েছি।”

“তোমার ছেলেকে আমিও সাদরে গ্রহণ করেছি। কিন্তু, সিদ্ধার্থ, চলো এবার কাজে যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে। আমার স্ত্রী যে শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, কমলা তারই উপর শুয়ে আছে। যে টিলার উপর আমার স্ত্রীর চিতা রচনা করেছিলাম, কমলার জন্য সেখানেই চিতা করব।”

চিতা তৈরী যখন শেষ হলো, বালকের ঘুম তখনো ভাঙেনি।

পুত্র

ভীত বালক কাঁদতে কাঁদতে মা'র শেষকৃত্য সম্পন্ন করল। সিদ্ধার্থ তাকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছে; বাসুদেবের কুটীরকে নিজের বাড়ীর মতো স্বচ্ছন্দ ভাবে গ্রহণ করতে বলেছে, তবু তার ভয় ভাঙেনি, বিষণ্ণ মুখে হাসি ফোটেনি। যে পাহাড়ে মা'র চিতা সাজানো হয়েছিল, দিনের পর দিন সেই পাহাড়ের উপর গিয়ে বসে চেয়ে থাকে দূর দিগন্তে; মনের কথা কাউকে বলতে পারে না; নিষ্ঠুর ভাগ্যের সঙ্গে নীরবে একাকী সংগ্রাম করে চলেছে।

সিদ্ধার্থ পুত্রের সহিত ব্যবহার করত গভীর সহানুভূতির সঙ্গে; তাকে একা থাকতে দিত, শোকের মর্যাদা ছিল তার কাছে। সিদ্ধার্থ বুঝত, ছেলে এখনো তাকে আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না; সেও পিতার মতো তাকে ভালোবাসতে পারে নি। ক্রমশঃ সিদ্ধার্থ দেখল, এগারো বছরের বালক মার আদর পেয়ে বখে গেছে; ধনীর জীবন যাত্রায় সে অভ্যস্ত; নরম বিছানা, সুস্বাদু খাদ্য এবং ভৃত্যের সেবা পেয়ে এসেছে এতদিন। আজ হঠাৎ এই দরিদ্রের কুটীরে অনভ্যস্ত কঠোর জীবনের মধ্যে

পড়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ নয়। সিদ্ধার্থ তার জন্য জোরও করল না; সেই অবস্থায় যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যেতে পারে তার ত্রুটি হলো না; সে পুত্রের জন্য যতটা সম্ভব ভালো খাদ্য সংগ্রহ করে রাখে। সিদ্ধার্থের আশা আছে স্নেহ দিয়ে একটু একটু করে পুত্রকে জয় করে নেবে।

পুত্রকে পেয়ে সিদ্ধার্থের মনে হয়েছিল তার জীবনে এসেছে নতুন সুখ, নতুন ঐশ্বর্য। সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু সিদ্ধার্থের আশা পূর্ণ হলো না। পুত্রের একগুঁয়েমি এবং প্রতিকূলতা দূর হবার লক্ষণ নেই; সে দাম্ভিক, উদ্ধত, কর্মবিমুখ; প্রবীণদের সম্মান করে না; বাসুদেবের গাছ থেকে ফল চুরি করে আনে। পুত্রের স্বভাবের পরিচয় পেয়ে সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল পুত্র তার জন্য সুখ ও শান্তি নিয়ে আসেনি, এনেছে শুধু দুঃখ ও ঝঞ্ঝাট। কিন্তু এরই মধ্যে সিদ্ধার্থ পুত্রকে ভালোবেসে ফেলেছে; এই ভালোবাসার সঙ্গে দুঃখ ও যন্ত্রণা জড়িত থাকলেও ক্ষতি নেই, তবু পুত্রহীন জীবনের সুখ ও শান্তি সে আর ফিরে পেতে চায় না।

বালক কুটীরে থাকে সুতরাং দুই বন্ধু দিনের কাজ ভাগ করে নিল। বাসুদেব থাকে খেয়া নৌকা নিয়ে, সিদ্ধার্থ ঘরের কাজ করে, প্রয়োজন হলে মাঠে যায়। পুত্রের নিকটে থাকবার সুযোগ পেল সিদ্ধার্থ।

মাসের পর মাস সিদ্ধার্থ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে কবে পুত্র তাকে বুঝতে পারবে, গ্রহণ করবে তার ভালোবাসা, প্রতিদান

দেবে সেই ভালোবাসার। পিতা-পুত্রের এই দ্বন্দ্ব বাসুদেবও নীরবে লক্ষ্য করছে। একদিন বালক ক্রুদ্ধ হয়ে দুটো ভাতের হাঁড়ি পর পর ভেঙে ফেলল। মর্মন্তুদ বেদনায় নির্বাক হয়ে ছেলের ঔদ্ধত্য দেখছিল সিদ্ধার্থ।

বাসুদেব এসে তাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে বলল, "সিদ্ধার্থ, আমাদের বন্ধুত্বের দাবীতে তোমাকে একটা কথা বলছি, এর জন্য ক্ষমা ক'রো।" আমি লক্ষ্য করে দেখছি, তুমি আজকাল বড় উদ্বিগ্ন থাক, তোমার মনে সুখ নেই। বন্ধু, ছেলে তোমাকে দুঃখ দিচ্ছে এবং সে দুঃখের আমিও অংশভাগী। যে পক্ষী-শাবকটি ঘরে নিয়ে এসেছ সে অন্য এক ধরণের জীবনে, অন্য এক ধরণের নীড়ে বাস করতে অভ্যস্ত। তোমার মতো বীতস্পৃহ হয়ে সে নগরের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে আসেনি; ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলাসের জীবনকে ত্যাগ করে আসতে হয়েছে। আমি নদীকে প্রশ্ন করেছি, সে হেসে উঠেছে। হেসেছে তোমার এবং আমার নির্বুদ্ধিতায়। জল ছুটে যাবে জলের কাছে, যৌবন মিলিত হতে চাইবে যৌবনের সঙ্গে। এখানে থেকে তোমার পুত্র সুখী হতে পারবে না। তুমি নদীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, শোন সে কি বলে।"

ব্যথিতচিত্তে সিদ্ধার্থ বন্ধুর মমতা-ভরা মুখের দিকে চোখ তুলে চাইল। মৃদুকণ্ঠে বলল, "ওকে ছেড়ে কি করে থাকব? আমাকে আরো কিছু সময় দাও, বন্ধু। ছেলের মন পাবার

জন্য আমি সারাক্ষণ চেষ্টা করে চলেছি। ধৈর্য ও ভালোবাসা দিয়ে একদিন ওর হৃদয় জয় করতে পারব সে বিশ্বাস আমার আছে। একদিন নদী ওর সঙ্গেও কথা বলবে। নদীর আহ্বানেই হয়তো ও এখানে এসেছে।"

বাসুদেবের মুখে ক্ষীণ হাসিটুকু উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; বলল, "নিশ্চয় ; নদীর আহ্বানেই ও এসেছে ; কারণ তোমার ছেলে তো অনন্ত জীবনের বাইরে নয়। কিন্তু এই অনন্ত জীবনধারার কোন পথে চলবার, কোন কাজ করবার এবং কোন দুঃখ ভোগের প্রয়োজনে এই আহ্বান এসেছে ? সে কথা তুমি কিংবা আমি কেউ জানি না। তোমার ছেলের হৃদয় কঠিন এবং দাম্ভিকতায় পূর্ণ ; সুতরাং তার দুঃখ সামান্য হবে না। সে অনেক দুঃখ ভোগ করবে, অনেক ভুল করবে, অনেক পাপ ও অন্যায় করবে। বন্ধু, বলো ত', তুমি কি তোমার পুত্রকে শিক্ষা দিচ্ছ ? সে কি তোমার কথা মেনে চলে ? তুমি কি তাকে শাস্তি দাও. প্রহার করো ?"

"না, বাসুদেব। আমি এসবের কিছুই করি না।"

"তা আমি জানতাম। তুমি তার উপর কঠোর হতে পার না, তাকে শাস্তি দাও না, আদেশ কর না,—কারণ তুমি জান কঠোরতার চেয়ে মৃদুতার, পাথরের চেয়ে জলের এবং বলবত্তা অপেক্ষা ভালোবাসার শক্তি বেশি। খুব ভালো কথা। আমি তোমার ধৈর্যের প্রশংসা করি। কিন্তু তুমি যে ওর প্রতি

কঠিন হতে পার না, ওকে শাস্তি দিতে পার না, সেটা কি তোমার দিক থেকে ভুল হচ্ছে না? তোমার ভালোবাসা দিয়ে কি পুত্রকে বন্দী করে রেখেছ না? তোমার করুণা ও ধৈর্য প্রতিদিন বালকের ব্যবহারকে ধিক্কার দেয়; তার পক্ষে নিজের চরিত্র সংশোধন করা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পড়ছে। তুমি এই গর্বিত, বখাটে বালককে জোর করে দুই বৃদ্ধের সঙ্গে ধরে রেখেছ। শুধু লবণ দিয়ে ভাত খাওয়াই যাদের কাছে বিলাসিতা, যাদের ভাবনা সম্পূর্ণ পৃথক, যাদের হৃদয় বুড়িয়ে গেছে, যাদের বুকের স্পন্দনের ছন্দ আলাদা,—তাদের সঙ্গে বাস করতে বাধ্য করছ এই বালককে। এই পরিবেশের মধ্যে ছেলেকে জোর করে রেখে শাস্তি দিচ্ছ না কি?"

সিদ্ধার্থ বিহ্বল হয়ে মাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "তাহ'লে আমার কি করা উচিত?"

বাসুদেব বলল, "ওকে নগরে নিয়ে যাও; নিয়ে যাও ওর মা'র বাড়ীতে। কমলার পুরনো চাকররা তো এখনো সে বাড়ীতেই আছে, তাদের কাছে নিয়ে যাও। যদি সেখানে কেউ না থাকে তাহ'লে ছেলেকে রেখে এস কোনো গুরুর আশ্রমে। শুধু শিক্ষার জন্য নয়, সেই আশ্রমই হবে তার নিজের জগৎ; পাবে বালকদের সাহচর্য। আমাদের জগৎ ও কখনো নিজের বলে গ্রহণ করতে পারবে না। তুমি এ বিষয়ে কোনো দিন ভেবে দেখ নি?"

সিদ্ধার্থ বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, "তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ। আমি প্রায়ই একথা ভেবেছি। কিন্তু যার হৃদয় এত কঠিন সে কি করে সংসারে বাস করবে? সে কি শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী হয়ে উঠবে না? সে কি বিলাস ও ক্ষমতার মোহে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে না? পুত্র কি পুনরাবৃত্তি করবে না পিতার ভুলগুলি? সংসারের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যাবার সম্ভাবনা কি নেই তার?"

বাসুদেব হাসল। সিদ্ধার্থের বাহু স্পর্শ করে বলল, "বন্ধু, তোমার প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করো নদীকে। শোন নদীর উত্তর, হেসে উড়িয়ে দাও তোমার যত আশঙ্কা। তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর তোমার ভুল থেকে পুত্র শিক্ষা লাভ করবে, ঐ ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা পাবে সে? সংসারের দুঃখ থেকে ছেলেকে কি রক্ষা করতে পারবে? কেমন করে বাঁচাবে? উপদেশ দিয়ে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, সৎপথের ইঙ্গিত দিয়ে? বন্ধু, ব্রাহ্মণকুমার সিদ্ধার্থের যে গল্প একদিন আমাকে বলেছিলে সে গল্পের শিক্ষা কি ভুলে গেছ? সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থকে পাপ, লোভ ও নির্বুদ্ধিতা থেকে কে রক্ষা করতে পেরেছে? পিতার ধর্মানুরাগ, গুরুর সদুপদেশ, তার নিজের জ্ঞান ও তত্ত্বানুসন্ধানের স্পৃহা কি বাঁচাতে পেরেছে তাকে? কোন পিতা, কোন্ গুরু, তাকে বিরত করতে পারত তার জীবনের নিজস্ব পথ ধরে চলতে? সংসারের মালিন্য জীবনকে করবে

মলিন, পূর্ণ হবে পাপের পসরা, নিজের হাতে জীবনের পাত্র থেকে পান করবে তিক্ত পানীয় ; কে বাধা দেবে ? সকল উপদেশ থাকে ধূলায় পড়ে, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এমনি করেই নিজস্ব পথ খুঁজে নিতে হয়। বন্ধু, তুমি কি ভেবেছ সংসারের এই কুটিল, কঠোর পথ অতিক্রম না করে কারো অব্যাহতি আছে ? হয়তো ভাবছ তোমার বালক পুত্রের কথা। সে যেন দুঃখ, যন্ত্রণা ও মোহভঙ্গের বেদনা না পায় ; সে জন্য যে পথ তুমি একদিন অতিক্রম করেছ সে পথ থেকে তাকে নিবৃত্ত করতে চাও। কিন্তু পুত্রের মঙ্গলকামনায় দশবার প্রাণ দিলেও তার ভাগ্য তুমি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতে পারবে না।"

একসঙ্গে এত কথা বাসুদেব কখনো বলেনি। বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিদ্ধার্থ কুটীরে ফিরে এল উদ্বিগ্নচিত্তে। সারারাত ঘুমোতে পারল না। বাসুদেব নতুন কথা কিছু বলেনি। সব কথাই সে জানে। কিন্তু জানার চেয়ে পুত্রস্নেহ প্রবল ; পুত্রের প্রতি গভীর আসক্তি তাকে অন্ধ করেছে, সে পুত্রকে হারাবার আশঙ্কায় ব্যাকুল। এমন করে এর আগে সিদ্ধার্থ কারো কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, অন্ধের মতো এমন করে আর কাউকে ভালোবাসেনি। কী গভীর বেদনা সে ভালোবাসায়, তবু কতো সুখ !

সিদ্ধার্থ বন্ধুর উপদেশ গ্রহণ করতে পারল না। ছেলেকে ত্যাগ করবে কেমন করে ? দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুত্র তাকে

আদেশ করে, অসম্মানজনক ব্যবহার করতে সাহস পায়। সিদ্ধার্থ নীরবে অপেক্ষা করে। ধৈর্য ও স্নেহের অস্ত্র দিয়ে সিদ্ধার্থ বোবা যুদ্ধ করে যায় প্রতিদিন। আশা আছে, একদিন পুত্রকে জয় করবে। বাসুদেবও নীরবে অপেক্ষা করছে ; সে বুঝতে পেরেছে বন্ধুর মনের কথা ; মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের মতো সে অপেক্ষা করে আছে। দু'বন্ধুই সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি।

একদিন বালকের মুখের গড়ন লক্ষ্য করতে করতে চোখের সামনে ভেসে উঠল কমলার মুখ। হঠাৎ সিদ্ধার্থের মনে পড়ল অনেকদিন আগে কমলা একবার তাকে একটা কথা বলেছিল। কমলা অভিযোগ করেছিল, "তুমি ভালোবাসতে পার না।" সিদ্ধার্থ স্বীকার করে নিয়েছিল এই অভিযোগ। নিজেকে সে তুলনা করেছিল আকাশের নক্ষত্রের সঙ্গে, অন্য লোক উড়ন্ত ঝরা পাতার মতো। তবু কমলার অভিযোগের মধ্যে যে তিরস্কারের কাঁটা ছিল তাকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেনি সিদ্ধার্থ। একথা সত্য, সিদ্ধার্থ ভালোবেসে আর একজনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে নি ; কখনো প্রশ্রয় দেয়নি প্রেমের নির্বুদ্ধিতাকে। সিদ্ধার্থ ভাবত সাধারণ লোকের সঙ্গে তার সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা এখানেই। কিন্তু এখন পুত্রকে পেয়ে, তাকে ভালোবেসে, তার কাছ থেকে দুঃখ পেয়ে সে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মানুষের একজন হয়ে উঠেছে। পুত্রস্নেহ তাকে উন্মত্ত করেছে, ভালোবাসার জন্য সে হয়েছে নির্বোধ।

জীবনের শেষ বেলায় এই প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করল এক অপূর্ব ও প্রবল ভালোবাসার। ভালোবাসা দিয়েছে গভীর দুঃখ ; কিন্তু তবু এই ভালোবাসাই তাকে উপরে তুলেছে, নবীন করেছে, দিয়েছে এমন এক ঐশ্বর্য যা আগে ছিল না কখনো।

আজ সিদ্ধার্থ অনুভব করল এই ভালোবাসা, এই অন্ধ পুত্র-স্নেহ, সাধারণ মানুষের একটি স্বাভাবিক অনুভূতি। এই তো সংসার। সিদ্ধার্থ ভাবল, এই ভালোবাসাও ব্যর্থ নয়, এরও প্রয়োজন আছে জীবনে ; কারণ ভালোবাসার বীজ রয়েছে মানুষেরই স্বভাবের মধ্যে। এই আবেগ, এই বেদনা, এই বোকামির অভিজ্ঞতাও লাভ করতে হয় জীবনকে পূর্ণ করবার জন্য।

ইতিমধ্যে পুত্র-স্নেহান্ধ পিতাকে সুযোগ করে দেয় ভালোবাসার পাগলামী করতে, ছেলের হৃদয় জয় করবার জন্য সাধনা করতে। সে পিতাকে মর্মাহত করে তার রুক্ষ মেজাজ দিয়ে। তার পিতার মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাকে আকর্ষণ করতে পারে, এমন কিছু নেই যা সে ভয় করবে। তার পিতা ভালো মানুষ, দয়ার্দ্রচিত্ত ভদ্রলোক ; হয়তো ধর্মভীরু কিংবা সাধু পুরুষও হতে পারেন। কিন্তু এসব গুণ দিয়ে বালকের চিত্ত জয় করা যায় না। যে পিতা তাকে এই জীর্ণ কুটিরে বন্দী করে রেখেছে সেই পিতাকে দেখলেই তার মন বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে যায় ; তার রূঢ় ব্যবহারের উত্তরে সিদ্ধার্থ শুধু হাসে, সকল অপমানের

উত্তরে ঢেলে দেয় অফুরন্ত স্নেহ, পুত্রের সকল দুরন্তপনা সহ্য করে হাসিমুখে। বালক মনে করে ধূর্ত বৃদ্ধ তাকে জয় করবার জন্য ক্ষমার কৌশল অবলম্বন করতে চায়। পিতা যদি তাকে তিরস্কার করতেন, দুর্ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে, তাহ'লে বরং সে সুখী হতো।

একদিন বালক স্পষ্ট করে বলল তার মনের কথা, প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল পিতার বিরুদ্ধে। সিদ্ধার্থ শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে আনতে বলেছিল; বালক সে কথায় কান না দিয়ে কুটীরে দাঁড়িয়ে রইল; ক্রুদ্ধ, উদ্ধত বালক মাটিতে পা ঠুকতে আরম্ভ করল; দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মুখের উপর চীৎকার করে ঘোষণা করল পিতার প্রতি তার ঘৃণা ও অবজ্ঞা।

"কেন, নিজে আনতে পার না?"—চীৎকার করে উঠল পুত্র। "আমি তোমার চাকর নই। জানি তুমি আমাকে প্রহার কর না। কিন্তু সে কি আর এমনি? সাহস কর না বলে'! ধর্মপরায়ণতা ও প্রশ্রয় দিয়ে তুমি সর্বদা আমাকে শাস্তি দাও, প্রমাণ করতে চাও আমি কত ছোট। তোমার ইচ্ছা আমি তোমার মতোই ধার্মিক, বিনয়ী ও বিজ্ঞ হবো; কিন্তু তোমার উপর আক্রোশ হচ্ছে বলেই সে পথে আমি যাব না; বরং চুরি করব, খুন করে নরকে যাব, তবু তোমার মতো হতে চাই না। তুমি আমার মা'র প্রেমিক হলেও

তোমাকে পিতা বলে আমি স্বীকার করি না ; তোমাকে ঘৃণা করি।”

এতদিনের সঞ্চিত ক্রোধ ও পুঞ্জীভূত অসন্তোষ আজ মুক্তি পেল উন্মত্ত কটূক্তির মধ্যে। এই বয়সে কঠোর জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে তার পিতা। তাই পিতার উপর ক্রোধের শেষ নেই। সিদ্ধার্থের উপর মনের ঝাল মিটিয়ে বালক কুটীর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, ফিরে এল গভীর রাত্রিতে।

পরদিন সকালে বালককে আর দেখা গেল না। বাসুদেব ও সিদ্ধার্থ যে রঙীন পেটিকায় যাত্রীদের পারের কড়ি সঞ্চয় করত সে পেটিকাও গেছে অদৃশ্য হয়ে। নদীর ঘাটে এসে দেখে নৌকা নেই। নদীর ওপারে নৌকা বাঁধা আছে দেখা গেল। পুত্র পালিয়েছে।

আগের দিন পুত্রের নির্মম কটূক্তি শোনবার পর থেকে মর্মান্তিক বেদনায় মুহ্যমান হয়ে আছে সিদ্ধার্থ। তবু তার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিলম্ব হলো না। সিদ্ধার্থ বলল, “ওকে খুঁজে আনতে হবে। ওর মতো শিশু বনের মধ্য দিয়ে একা যাবে কি করে? নিশ্চয়ই বিপদে পড়বে। বাসুদেব, এস একটা ভেলা তৈরি করে আমরা ওপারে যাই।”

বাসুদেব বলল, “হ্যাঁ, ভেলা তৈরি করতে হবে বৈকি! নৌকো তো আনতে হবে? কিন্তু বন্ধু, তোমার পুত্রকে যেতে দাও। সে তো আর শিশু নেই ; নিজের ভার নেবার বয়স

তার হয়েছে। সে নগরে ফিরে যাবার পথ সন্ধান করতে বেরিয়েছে,—সে ঠিকই করেছে। এ কথা তুমি ভুলে যেও না। এতদিন তুমি যা অবহেলা করেছ, বালক সেই কর্তব্য নিজেই পালন করবে। সে আজ নিজের ভার স্বহস্তে তুলে নিয়েছে, সে চলবে নিজের পথে। সিদ্ধার্থ, আমি দেখতে পাচ্ছি কী নিদারুণ বেদনা তুমি ভোগ করছ; কিন্তু এ বেদনা তো হেসে উড়িয়ে দেওয়া উচিত; তুমি নিজেই দু'এক দিনের মধ্যে আজকের বেদনার কথা মনে করে হেসে উঠবে।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল না। সে দা দিয়ে বাঁশ কেটে ভেলা তৈরি করতে আরম্ভ করেছে; বেত ও ঘাসের দড়ি দিয়ে বাঁশ বাঁধতে সাহায্য করতে লাগল বাসুদেব। স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে তারা দু'জনে নদীর অপর তীরে গিয়ে পৌঁছল।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, "দা সঙ্গে করে নিয়ে এলে কেন?"

বাসুদেব উত্তর দিল, "দাঁড়টা হয়তো নেই।"

সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল বাসুদেবের ইঙ্গিত। হয়তো ছেলে দাঁড় নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে, অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং তার অনুসরণ করতে যেন না পারে সে জন্য দাঁড় ভেঙে ফেলেছে। তাদের আশঙ্কা সত্য হলো। নৌকায় দাঁড় নেই। বাসুদেব নৌকোর তলার দিকে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাসল; যেন বলতে চাইল: তোমার পুত্রের অভিপ্রায়টা বুঝতে পারছ না? দেখছ না তার ইচ্ছা নয় আমরা অনুসরণ

করি? কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। দা দিয়ে কাঠ কেটে নতুন দাঁড় তৈরি করতে আরম্ভ করল। সিদ্ধার্থ বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল পুত্রের সন্ধানে। বাসুদেব বাধা দিল না।

অনেকক্ষণ বনে ঘুরে ঘুরে সিদ্ধার্থের মনে হলো বৃথা এই খোঁজা। সে ভাবল, বালক হয়তো অনেক আগেই বন ছেড়ে নগরে পৌঁছে গেছে, অথবা এখনো যদি পথে থাকে তবু তার সন্ধান পাওয়া সহজ হবে না; কারণ তাকে দেখতে পেলেই বালক লুকিয়ে থাকবে। সিদ্ধার্থ নিজের মন অনুসন্ধান করে দেখল পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে আর ব্যাকুল নয়। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বনের পথে পুত্র কোন বিপদে পড়েনি, কিংবা পড়বার আশঙ্কাও নেই। তবু সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল; পুত্রকে রক্ষা করতে নয়, হয়তো শুধু আর একবার দেখবার জন্যই। পুত্রকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় সিদ্ধার্থ বন পার হয়ে এসে পৌঁছল নগরের উপকণ্ঠে।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল হলো সে দাঁড়িয়ে আছে কমলার প্রমোদ উদ্যানের প্রবেশ পথে। একদিন এখানে দাঁড়িয়েই সে কমলাকে দেখেছিল পাল্‌কি চড়ে উদ্যানে প্রবেশ করতে। অতীতের ছবি সিদ্ধার্থের চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই বড় বড় দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখ, ধূলি মাখা রুক্ষ কেশ, উলঙ্গ-প্রায় নবীন সন্ন্যাসীকে আবার সে দেখতে পেল চোখের সামনে। উন্মুক্ত প্রবেশ পথের নিকটে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে

দেখতে লাগল উদ্যানের সৌন্দর্য। দেখল, উদ্যানের সুন্দর গাছগুলির ছায়ায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দীর্ঘকাল একভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ ভাবতে লাগল কত কথা; হারিয়ে যাওয়া অতীতের কত ছবি আবার উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল; নিজের জীবন কাহিনীর আর একবার জীবন্ত অভিনয় দেখল। আজ যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই বড় গাছগুলির নিচে দেখতে পেল সিদ্ধার্থ ও কমলাকে। স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল কমলার প্রথম চুম্বনের দৃশ্য। কমলার প্রেমের পাঠ তাকে দাম্ভিক করে তুলেছিল, তার ঘৃণা জেগেছিল সন্ন্যাস জীবনের উপরে। গর্ব ও ঔৎসুক্য নিয়ে সেদিন সিদ্ধার্থ প্রবেশ করেছিল সংসার জীবনে। সিদ্ধার্থ আবার নতুন করে দেখতে পেল ভৃত্যাবেষ্টিত কামস্বামীকে, তার উৎসব অনুষ্ঠান, পাশা খেলবার আড্ডা এবং গানের আসরের ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। সিদ্ধার্থ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে খাঁচায় বন্দী কমলার পোষা পাখিটা মধুর স্বরে গান করছে। তার অতীত জীবনেব পুনরাবৃত্তি হলো। আর একবার সে সংসার জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করল; আবার সে ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হলো, ক্লান্ত হলো, জীবনের অভিজ্ঞতা জাগাল বিবমিষা; মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা জাগল মনে, আর সেই মুহূর্তে আর একবার শুনতে পেল পবিত্র "ওম্।"

দীর্ঘকাল উদ্যানের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে থাকবার পর সিদ্ধার্থ

উপলব্ধি করল যে-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে এখানে এসেছে তা নির্বোধ আকাঙ্ক্ষা। সে তার পুত্রকে সাহায্য করতে পারবে না, কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না ; তার ইচ্ছাটা পুত্রের উপর চাপিয়ে দেওয়াও সঙ্গত হবে না। পলাতক বালকের প্রতি গভীর স্নেহ তাকে বন্দী করেছে ; যন্ত্রণাক্লিষ্ট ক্ষতের মতো এই পুত্র-স্নেহ তাকে সর্বদা বেদনা দেয়। অবশ্য সিদ্ধার্থ জানে এই ক্ষত একদিন শুকিয়ে যাবে, তার মধ্যে পচন সৃষ্টির সুযোগ পাবে না।

তবু এই মুহূর্তে ক্ষতটা শুকিয়ে যায়নি, তাই সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে পুত্রের পশ্চাতে ছুটে এসেছে, আজ তার কোনো মূল্য নেই সিদ্ধার্থের কাছে ; অন্তরে শুধু বিরাট শূন্যতা। বিষণ্ণ চিত্তে সিদ্ধার্থ মাটির উপর বসে পড়ল। সে অনুভব করল, কি যেন একটা মরে গেল তার হৃদয়ে। জীবনে আর আনন্দ নেই, নেই পথ চলার কোনো লক্ষ্য। সে বিষণ্ণ চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল। এমনি করে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে, কান পেতে শুনতে, সিদ্ধার্থ শিখেছে নদীর কাছে। পথের ধূলার উপর বসে সে কান পেতে রইল, শুনতে লাগল তার ক্লান্ত, ব্যথিত হৃদয়ের স্পন্দন। সে আশা করে আছে একটি স্বর শোনবার জন্য। কত প্রহর পার হয়ে গেল, সিদ্ধার্থ বসে আছে একভাবে। তার সকল স্বপ্ন গেছে হারিয়ে, ডুব দিয়েছে রিক্ততার সমুদ্রে। শূন্যতার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসবার পথ

চোখে পড়ে না। বেদনা যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন মৃত্নস্বরে সিদ্ধার্থ উচ্চারণ করল 'ওম্', 'ওম্' দিয়ে পূর্ণ করল নিজেকে। উদ্যানের ভিক্ষুরা লক্ষ্য করল একটি লোক বহুক্ষণ ধরে একভাবে বসে আছে, পথের ধূলায় তার সাদা চুল ঢেকে যাচ্ছে; একজন ভিক্ষু এগিয়ে এসে তার সামনে ত্নটো পাকা কলা রেখে গেল। সিদ্ধার্থ তা দেখতে পেল না।

কাঁধের উপরে হাতের স্পর্শ অনুভব করে সিদ্ধার্থের মোহ ভেঙ্গে গেল। সেই ভীরু, মৃত্ন স্পর্শটি চিনতে দেরি হলো না। সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানাল বাসুদেবকে। বাসুদেবের মমতা ভরা মুখ, হাস্যোজ্জ্বল বলিরেখা এবং দীপ্ত চোখের দিকে চেয়ে তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। এবার দেখতে পেল পায়ের কাছে ত্নটো পাকা কলা পড়ে আছে। কলা ত্নটো তুলে নিয়ে একটা দিল বাসুদেবকে, আর একটা খেল নিজে। আবার ত্ন'জনে বনের পথ পার হয়ে পৌঁছল খেয়াঘাটে। কী ঘটেছে তার উল্লেখ কেউ করল না, বালকের নাম কেউ মুখে আনল না, বলল না তার পালিয়ে যাবার কথা, কী গভীর বেদনা পেয়েছে সিদ্ধার্থ তার আলোচনাও করল না তারা। কুটিরে পৌঁছে সিদ্ধার্থ বিছানায় শুয়ে পড়ল; একটু পরে বাসুদেব যখন তার জন্য এক বাটি ডাবের জল নিয়ে এল তখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওম্‌

দীর্ঘ দিন পার হয়ে গেল ; তবু আঘাতের তীব্র জ্বালাটা দূর হলো না। সিদ্ধার্থ প্রতিদিন কত যাত্রী পার করে দেয় ; তাদের অনেকের সঙ্গে থাকে পুত্র কিংবা কন্যা। পুত্র-কন্যাসহ যাত্রীদের দেখে সে ঈর্ষা দমন করতে পারে না ; মনে মনে ভাবে : এত লোকের ভাগ্যে এমন মহৎ আনন্দ আছে,—আমার কেন নেই ? যারা শয়তান, যারা চোর, যারা দস্যু, তাদেরও সন্তান আছে ; ছেলেমেয়েদের তারা ভালোবাসে এবং প্রতিদানে সন্তানদের কাছ থেকে পায় ভালোবাসা। শুধু সিদ্ধার্থ এই সুখ থেকে বঞ্চিত। আজকাল এমনি শিশুসুলভ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা নিয়ে সে মনে মনে আলোচনা করে। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের কত কাছাকাছি সে নেমে এসেছে !

এখন সে সংসারের লোকদের নতুন চোখে দেখতে শিখেছে ; পূর্বের মতো বুদ্ধির অহংকার নেই, গর্ব নেই ; তাই আজকের দেখায় আছে আন্তরিকতা, কৌতূহল ও সহানুভূতি।

ব্যবসায়ী, সৈন্য, নারী—এমনি কত বিভিন্ন ধরণের লোক সিদ্ধার্থ প্রত্যহ পার করে দেয়। একদিন এদের অচেনা মনে

হতো, মনে হতো এদের সঙ্গে তার যোগ নেই ; কিন্তু আজ আর তা মনে হয় না। তাদের চিন্তা, তাদের মতামত, সে এখনো গ্রহণ করতে পারেনি সত্য, কিন্তু গ্রহণ করেছে তাদের আকাঙ্ক্ষা, তাদের জীবনেব উদ্দীপনা। যদিও সিদ্ধার্থ আত্ম-সংযমের উচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, যদিও সে তার সর্ব শেষ আঘাত নীরবে সয়েছে, তবু আজ সে অনুভব করছে জনসাধারণ তার ভাই। তাদের গর্ব, আকাঙ্ক্ষা ও তুচ্ছতা এখন আর অসম্ভব মনে হয় না তার কাছে। এখন এই সাধারণ মানুষগুলিকে যেন হঠাৎ বুঝতে পারা যাচ্ছে, তারা ভালোবাসার পাত্র হবার যোগ্যতা লাভ করেছে ; এমন কি, এখন তাদের শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করতেও দ্বিধা নেই সিদ্ধার্থের। সন্তানের জন্য মাতার অন্ধ ভালোবাসা, একমাত্র পুত্রের জন্য স্নেহাসক্ত পিতার হাস্যকর অহংকার, দর্পিতা তরুণীর অলংকারের কামনা এবং পুরুষের প্রশংসা লাভেব জন্য নিরন্তর চেষ্টা—এসব সিদ্ধার্থ এখন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখেছে। এসব সাধারণ, হাস্যকর কিন্তু অতিশয় প্রবল এবং জৈব প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধার্থের নিকট আর তুচ্ছ নয়। এরাই মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়, মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে, গৃহকোণ ছেড়ে দেশ-দেশান্তরের পথে বেরিয়ে পড়বার ইশারা দেয় ; এই কামনা-বাসনার জন্যই মানুষ যুদ্ধ করে, কত গভীর দুঃখ সহ্য করে। এ জন্যই আজ সিদ্ধার্থ সংসারের সাধারণ লোকদের

ভালোবাসে। তাদের সকল আকাঙ্ক্ষা ও অভাববোধের মধ্যে সিদ্ধার্থ দেখেছে জীবনকে, দেখেছে জীবনীশক্তির সতেজ দীপ্তি; আর দেখতে পেয়েছে অবিনশ্বর পরম ব্রহ্মের বিকাশ। একদিন যাদের সংসারাসক্ত বলে অবজ্ঞা করেছে আজ তাদের অন্ধ আনুগত্য, অন্ধ শক্তি ও অধ্যবসায় তাকে মুগ্ধ করেছে। শুধু একটি ছোট জিনিস ছাড়া, একটিমাত্র অতিশয় ক্ষুদ্র জিনিস ব্যতীত এদের মধ্যে ঋষি ও ধ্যানীর সকল গুণই আছে; নেই শুধু সৃষ্টির ও সকল জীবনের মধ্যে ঐক্যবোধের জ্ঞান। কিন্তু অনেক সময় সিদ্ধার্থের আবার সংশয় জেগেছে যে এই জ্ঞান, এই চিন্তার মূল্য কি সত্যি এত বেশি? এই অভাবের উপর জোর দিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কি ছেলেমানুষের মতো নিজেদেরই চাটুবাদ করছে না? কে জানে, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা হয়তো চিন্তার ক্ষমতাসম্পন্ন শিশু ছাড়া আর কিছু নন। অন্য সব দিক থেকে সংসারের সাধারণ লোকেরা চিন্তাবীরদের সমকক্ষ, এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা শ্রেষ্ঠ,—যেমন বনের পশুরা সে সব কাজে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সব কাজ একাগ্র অধ্যবসায় নিয়ে করতে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে পশুর মনে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে হিংস্র একগুঁয়েমি জেগে ওঠে মানুষের মধ্যে কদাচিৎ তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে সিদ্ধার্থ আপন অন্তরে উপলব্ধি করল প্রকৃত

জ্ঞানের স্বরূপ ; ক্রমে এই উপলব্ধি পূর্ণতা লাভ করল তার মধ্যে। এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে কি খুঁজে খুঁজে জীবনের দীর্ঘ পথ চলেছে ; আজ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে জীবনব্যাপী অন্বেষণের লক্ষ্য। সে আর কিছু নয় ; শুধু আত্মার প্রস্তুতি এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে ঐক্যবোধের গূঢ় অনুভূতি। এই অনুভূতি তার মধ্যে ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করছে,—যেমন করেছে বাসুদেবের মধ্যে। অন্তরের এই অনুভূতির ফলে বাসুদেবের শিশুর মতো সরল ও পবিত্র মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে সৃষ্টির চিরপূর্ণতা, সংগতি ও ঐক্যবোধের দীপ্তি।

কিন্তু সেই ক্ষতের জ্বালা এখনো দূর হয়নি। পুত্রের কথা মনে পড়লে এখনো তার ব্যথাক্লিষ্ট হৃদয় ব্যগ্র হয়ে ওঠে ঃ পুত্রের জন্য এখনো সে মনের কোনে সকরুণ স্নেহ লালন করে ; ভালোবাসার সকল নির্বুদ্ধিতার স্তরগুলি সে পার হয়েছে, এখন আছে শুধু ভালোবাসার বেদনা,—যে বেদনার অদৃশ্য দাঁত দিনের পর দিন গভীরতর হয়ে বসছে তার হৃদয়ে। পুত্র যে ভালোবাসার শিখা জ্বালিয়ে গেছে সে শিখা আজও জ্বলছে অম্লান জ্যোতিতে।

একদিন পুরাতন ক্ষতের বেদনাটা যখন তীব্র হয়ে উঠেছে তখন গভীর আকাঙ্ক্ষায় অভিভূত হয়ে সিদ্ধার্থ নদীর ওপারে গেল ; নগরে গিয়ে পুত্রকে খুঁজে বার করবে,-এই উদ্দেশ্য নিয়ে

নৌকা থেকে সিদ্ধার্থ তীরে নামল। তখন গ্রীষ্মকাল, নদীর উচ্ছলতা নেই ; শান্ত নদী বয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। তবু হঠাৎ নদীর বুক থেকে আশ্চর্য শব্দ ভেসে এলো ; নদী হাসছে, স্পষ্ট শোনা গেল সেই হাসি। বৃদ্ধ পাটনীর দিকে চেয়ে চেয়ে নদী সানন্দে খিল খিল করে হাসছে। সিদ্ধার্থ থমকে দাঁড়াল ; মাথা নিচু করে জলের উপর কান পেতে রাখল ভালো করে শোনবার জন্য। সেই মন্থর-গতি স্বচ্ছ জলের মধ্যে সিদ্ধার্থ তার মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল ; বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল এমনি আর একটি মুখ ; আজকের প্রতিবিম্বিত মুখের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। সে মুখ যাঁর, তাঁকে এতদিন ভুলে ছিল সিদ্ধার্থ। আজ চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই মুখের মালিককে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে, তার পিতাকে। পিতার সঙ্গে ছিল তার গভীর অন্তরঙ্গতা, ভালোবাসতো তাঁকে, হয়তো বা ভয়ও করত। আজ মনে পড়ল যৌবনে একদিন কেমন করে পিতাকে বাধ্য করেছিল সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিতে, কেমন করে বিদায় নিয়েছিল। সেই ছিল শেষ বিদায়, আর কখনো গৃহে ফিরেনি সিদ্ধার্থ। আজ পুত্রের জন্য সিদ্ধার্থ যে বেদনা ভোগ করছে, সে বেদনা কি পিতাকেও ভোগ করতে হয়নি তার জন্য ? পুত্রকে আর একবারও না দেখেই তো দীর্ঘকাল পূর্বে নিঃসঙ্গ পিতা পরলোক গমন করেছেন। সিদ্ধার্থও কি ঠিক সেই পরিণতি আশা করবে না ? সৃষ্টির অন্ধ

ভাগ্যচক্র নিরন্তর ঘুরছে ; ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় ; কী বিচিত্র এই প্রহসন !

নদী হাসছে। হ্যাঁ, তাই হয়। দুঃখ চক্রাকারে ঘুরে আসে। যে দুঃখ ভোগ করা হয়নি প্রথম জীবনে, তা হয়তো দেখা দেবে জীবনের শেষে। এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সিদ্ধার্থ আবার নৌকায় উঠল, ফিরে এল কুটিরের ঘাটে , একবার মনে পড়ছে পিতার কথা, একবার পুত্রের কথা ; আবার মনে পড়ছে, নদী হেসে তাকে বিদ্রূপ করেছে। সিদ্ধার্থের অন্তরে জেগেছে দ্বন্দ্ব, পড়েছে হতাশার ছায়া ; নিজেকে, সমগ্র সংসারকে হেসে বিদ্রূপ করতে ইচ্ছা হয়। হৃদয়ের ক্ষতটা এখনো মিলিয়ে যায়নি, ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার মন এখনো বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। দুঃখকে জয় করতে পারেনি এখনো, ফিরে পায়নি অন্তরের প্রশান্তি। তবু, আজ এই মুহূর্তে, আশা জেগেছে সে দুঃখ জয় করতে পারবে। বাসুদেবের নিকট সবকিছু স্বীকার করবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় মন পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে লোকটি অন্যের কথা নীরবে ধৈর্য সহকারে শোনবার কৌশল আয়ত্ত করেছে, তার কাছে সিদ্ধার্থ কিছুই গোপন করবে না,—সব খুলে বলবে।

বাসুদেব কুটিরে বসে বসে ঝুড়ি তৈরি করছে। এখন সে আর খেয়ানৌকায় কাজ করে না। তার চোখের দৃষ্টি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে, হাত ও বাহু ধীরে ধীরে শক্তিহীন হয়ে

পড়ছে। কিন্তু তার মুখমণ্ডলে আনন্দ ও প্রশান্ত কল্যাণের দীপ্তি এখনো ম্লান হয়নি।

সিদ্ধার্থ বৃদ্ধের পাশে বসে বলতে আরম্ভ করল তার কথা। যে সব কথা কোনদিন বলেনি, আজ সিদ্ধার্থ তা বলছে। ক্ষতের জ্বালায় অস্থির হয়ে কেমন করে সেবার নগরে গিয়েছিল, ভাগ্যবান পিতাদের দেখে ঈর্ষা জাগবার কথা, কেমন করে নিজের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে সচেতন হলো, এবং অন্তরের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হবার কথা—একে একে সব সে বলল। বাসুদেবকে সব বলা যায়, চরম বেদনার অনুভূতিও তার কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা হয় না। তার অন্তরের রক্তস্রাবী গোপন ক্ষতটা তুলে ধরল বাসুদেবের সামনে; নগরে পুত্রের সন্ধানে যাবার জন্য আজ যে নদী পার হয়ে ওপারে গিয়েছিল, তারপর নদী তার বোকামিতে হেসে ওঠায় আবার সে ফিরে এসেছে—সেই সকল কথা বাসুদেবকে খুলে বলল।

বাসুদেব প্রশান্ত মুখে শুনছে সিদ্ধার্থের কথা। বাসুদেবের এমন গভীর মনোযোগ সিদ্ধার্থ পূর্বে আর কখনো দেখেনি। সিদ্ধার্থ অনুভব করছে তার সকল যাতনা, তার সকল দুশ্চিন্তা এবং যত গোপন আকাঙ্ক্ষা,—সব স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে বাসুদেবের কাছে, এবং আবার ফিরে আসছে তার মধ্যে। নদীতে স্নান করলে যেমন দেহ শীতল হয়, নদীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা যায়, তেমনি বাসুদেবের মতো শ্রোতার কাছে

হৃদয় উন্মুক্ত করলে ক্ষতের জ্বালা শান্ত হয়, শ্রোতার সঙ্গে একাত্মবোধের অনুভূতি জাগে। নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে করতে সিদ্ধার্থের মনে হলো তার শ্রোতা চিরপরিচিত বাসুদেব যেন নয়, কোনো সাধারণ মানুষ নয়। গাছ যেমন বৃষ্টির জল শোষণ করে তেমনি এই নিশ্চল নিস্তব্ধ মূর্তিটি শোষণ করছে তার প্রত্যেকটি কথা। হঠাৎ সিদ্ধার্থের মনে হলো ঐ স্থির মূর্তিটি বাসুদেবের নয, বাসুদেব আর নেই, সিদ্ধার্থ অচঞ্চল মূর্তির মধ্যে দেখছে নদীকে, শাশ্বত মহাকালকে, স্বয়ং ভগবানকে। বাসুদেবের মধ্যে এই পরিবর্তন তাকে অভিভূত করল ; কিন্তু যতই সে বাসুদেবেব পরিবর্তনকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করল ততই অনুভব করল এই পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বহুদিন থেকে, হযতো বা চির দিন, বাসুদেব এমনি ছিল, তার বাহ্য রূপের পশ্চাতে ছিল আর একটি রূপ ; আজ বাসুদেবের মধ্যে যে নতুন রূপ দেখে সে বিস্মিত হয়েছে, তা আছে বহুদিন থেকে ; শুধু সিদ্ধার্থ দেখতে পায়নি, তাব দেখবার দৃষ্টি ছিল না। লোকে দেবতাদের যেরূপ শ্রদ্ধা করে সিদ্ধার্থের মনেও এই মুহূর্তে বাসুদেবের প্রতি সেই শ্রদ্ধা জেগেছে। কিন্তু এ শ্রদ্ধা স্থায়ী হবে না সে কথাও জানে সিদ্ধার্থ। সে মনে মনে বিদায় নিল বাসুদেবের কাছ থেকে ; কিন্তু তার কথা বন্ধ হলো না।

সিদ্ধার্থের কথা শেষ হলো ; বাসুদেব তার ক্ষীণ দৃষ্টি রাখল

সিদ্ধার্থের মুখের উপর। বাসুদেব একটি কথাও বলল না, কিন্তু তার মৌন মুখমণ্ডল থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল প্রেম ও প্রশান্তি, জ্ঞান ও সহানুভূতি। বাসুদেব নীরবে সিদ্ধার্থের হাত ধরে তাকে নিয়ে এলো নদীতীরে, একটা আসনের উপর দুজনে পাশাপাশি বসল; নদীর দিকে চেয়ে চেয়ে বাসুদেবের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

বাসুদেব বলল, "তুমি নদীর হাসি শুনেছ, কিন্তু তার সব কথা শোননি। কান পেতে থাক, আরো কত কথা শুনতে পাবে।"

কান পেতে রইল দু'জনে। নদীর বহু স্বরের মিলিত সঙ্গীত ভেসে আসছে। সিদ্ধার্থ নদীর দিকে চেয়ে প্রবহমান জলধারার মধ্যে দেখতে পেল কত ছবি। সে দেখতে পেল তার পিতাকে ;—নিঃসঙ্গ, পুত্রশোকে কাতর। ঠিক তেমনি দেখল নিজের ছবি; দূরগামী পুত্রের জন্য স্নেহে ব্যাকুল হয়ে সিদ্ধার্থ একাকী পথ চলছে; আর একটি ছবি ভেসে উঠল; দেখল, তার পুত্র একাকী ব্যগ্র হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে জীবনের কামনাতপ্ত পথে। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ, লক্ষ্য প্রত্যেককে অভিভূত করেছে, লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না, সবাই দুঃখ ভোগ করছে।

বাসুদেব তার নীরব দৃষ্টি দিয়ে প্রশ্ন করল, "শুনতে পাচ্ছ?" সিদ্ধার্থ মাথা নেড়ে জানাল সে শুনতে পাচ্ছে।

"আরো ভালো করে শোন!" চুপি চুপি বলল বাসুদেব।

সিদ্ধার্থ আরো গভীর ভাবে শুনতে চেষ্টা করল। পিতার ছবি, তার নিজের ছবি, পুত্রের ছবি,—সব একাকার হয়ে গেল। একবার কমলার ছবি ফুটে উঠল, আবার ভেসে চলে গেল নদীর জলের সঙ্গে। গোবিন্দের ছবি, আরো কত লোকের ছবি ভেসে এল, আবার বয়ে চলে গেল। তারা প্রত্যেকে আজ নদীর অংশ হয়ে গেছে। তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল এই নদী; তারা কামনা, বাসনা ও বেদনা নিয়ে এসেছে এই নদীর স্রোতপ্রবাহে, তাই নদীর স্বরও কত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, গভীর দুঃখে পূর্ণ। নদী বয়ে চলেছে তার লক্ষ্যের দিকে। সিদ্ধার্থ আজ উপলব্ধি করল এই চির প্রবহমান নদী তাকে দিয়ে, তার আত্মীয় স্বজন এবং সকল পরিচিত ব্যক্তিদেব দিয়ে তৈরী। নদীর প্রত্যেকটি ঢেউ, প্রতিটি জলকণা দুঃখময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ছুটে চলেছে লক্ষ্যের দিকে; আর সে লক্ষ্য তো একটি নয়, কত লক্ষ্য: জলপ্রপাত, সমুদ্র, জলপ্রবাহ, মহাসাগর। জল বাষ্প হয়, মেঘ হয়ে উপরে ওঠে, নেমে আসে বৃষ্টি হয়ে; বৃষ্টির জল ঝর্ণা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে পাহাড়ের বুকে, ঝর্ণা নেমে আসে নদিকা হয়ে, নদিকা হয় নদী। এমনি করেই নিত্য নতুন রূপ গ্রহণ করছে, অখণ্ড গতিশীলতা নদীকে দিয়েছে অনন্ত যৌবন। নদীর স্বরে যে ব্যাকুলতা ছিল তা যেন বদলে গেল। এখনো তার স্বরে আছে বেদনার রেশ, তবু

অন্য অনেক নতুন সুর মিলেছে তার সঙ্গে,—আনন্দ ও বেদনা, মঙ্গল ও অমঙ্গল, হাসি ও কান্নার সুর মিশে গেছে ; কত শত শত, সহস্র সহস্র স্বর নদীর স্বরের মধ্যে এক হয়ে গেছে।

সিদ্ধার্থ কান পেতে শুনছে। শুনছে নিবিষ্ট চিত্তে, সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে, সম্পূর্ণ শূন্য মনে, সবকিছু অন্তরে টেনে নিয়ে। এখন তার মনে হলো সে সম্পূর্ণরূপে শিখেছে শোনবার কৌশল। নদীর স্বরের মধ্যে অসংখ্য সুর সে আগেও শুনেছে, কিন্তু আজকের শোনাটা নতুন। আজ সে আর বিভিন্ন স্বরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারল না ; আনন্দের স্বর থেকে কান্নার স্বরকে, শিশুর স্বর থেকে বয়স্কের স্বরকে আলাদা করা যায় না। সব মিলে একটি স্বর হয়েছে, হারিয়ে গেছে অসংখ্য স্বরের পৃথক স্বাতন্ত্র্য। প্রার্থীর দীর্ঘশ্বাস, বিজ্ঞের হাসি, মুমূর্ষুর আর্তনাদ সব এক হয়ে গেছে নদীর স্বরের মধ্যে। সহস্র সহস্র বিচিত্র ধ্বনির ঐকতান এই নদীর স্বর। সকল স্বর, সকল লক্ষ্য, সকল কামনা, সকল বেদনা, সকল আনন্দ, সকল মঙ্গল ও অমঙ্গল নিয়েইতো এই সংসার। এদের সবাইকে নিয়ে ঘটনা প্রবাহ, এরা সবাই মিলে রচনা করেছে জীবনের সঙ্গীত। সিদ্ধার্থ হাসি ও কান্নার স্বরকে আলাদা করে শুনছে না ; যখন সে নদীর মধ্যে শুনছে সহস্র স্বরের মিলিত ধ্বনি, তখন সেই হাজারো স্বরের মিলিত সঙ্গীতে থাকে শুধু একটি কথা : ওম্—পূর্ণতা।

"শুনছ ?"—বাসুদেব আবার প্রশ্ন করল তার নীরব দৃষ্টি দিয়ে।

বাসুদেবের মুখে উজ্জ্বল হাসি। নদীর হাজারো স্বর ছাপিয়ে যেমন শোনা যায় 'ওম্' ধ্বনি, তেমনি বাসুদেবের কুঞ্চিত মুখের বলিরেখার উপর ছড়িয়ে আছে একটি উজ্জ্বল, প্রশান্ত হাসির দীপ্তি। বাসুদেবের মুখের সেই অপূর্ব হাসি ধীরে ধীরে ফুটে উঠল সিদ্ধার্থের মুখে। তার ক্ষত শুকিয়ে গেছে, বেদনা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে; সৃষ্টির অখণ্ড ঐক্যের মধ্যে ডুবে গেছে সিদ্ধার্থের ব্যক্তিসত্তা।

সেই মুহূর্ত থেকে ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ করল সিদ্ধার্থ। জ্ঞানের প্রশান্ত দীপ্তি ফুটে উঠেছে তার মুখে। কামনার দ্বন্দ্ব যে জয় করেছে, যে মুক্তিলাভ করেছে, বিশ্বের জীবনধারার সঙ্গে যে নিজের জীবনের সঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে যার অন্তর সহানুভূতি ও করুণায় পূর্ণ, জীবনের স্রোতে যে আত্মসমর্পণ করে সৃষ্টির ঐক্যানুভূতির মধ্যে ডুব দিয়েছে, শুধু তার মুখেই এমন দীপ্তি সম্ভব।

বাসুদেব উঠে দাঁড়াল। সিদ্ধার্থের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল তার দুই চোখ জ্ঞানের প্রশান্ত দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সিদ্ধার্থের কাঁধ আশীর্বাদের ভঙ্গীতে স্পর্শ করে স্নেহকোমল কণ্ঠে বাসুদেব বলল, "এই শুভ মুহূর্তটির জন্যই আমি অপেক্ষা করে ছিলাম, বন্ধু। সেই শুভক্ষণ এসেছে, এখন আমি বিদায় নেব। বাসুদেব হয়ে অনেকদিন কাটিয়েছি পাটনীর কাজে। সে জীবন আজ শেষ হলো। সিদ্ধার্থ,

তোমার কাছ থেকে, আমার কুটীরের কাছ থেকে এবং এই প্রিয় নদীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।"

সিদ্ধার্থ নত হয়ে প্রণাম করল বাসুদেবকে।

"আমি জানতাম,"—মৃদুস্বরে বলল সিদ্ধার্থ। "তুমি কি বনে যাবে ?"

"হ্যাঁ, বনে যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি সৃষ্টির ঐক্যপ্রবাহে ডুবে যেতে।"—দীপ্ত কণ্ঠে বলল বাসুদেব।

বাসুদেব চলে গেল। সিদ্ধার্থ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার পথের দিকে। সিদ্ধার্থ গভীর আনন্দ ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে দেখছে বাসুদেবের ধীরে ধীরে দূরে চলে যাওয়া। প্রতি পদক্ষেপে কী শান্তি, মুখে কী দীপ্তি, সমগ্র দেহ থেকে কী আলোর বিচ্ছুরণ !

গোবিন্দ

কমলা তার উদ্যান বুদ্ধের শিষ্যদেব ব্যবহারেব জন্য দান করেছিল। একবার অন্যান্য ভিক্ষুদের সঙ্গে কিছুদিন গোবিন্দ বিশ্রাম করেছিল সেই উদ্যানে। সেখানে থাকতে থাকতে সে শুনতে পেয়েছে নদীতীরের বৃদ্ধ পাটনীর কথা ; কমলার উদ্যান থেকে খেয়াঘাট একদিনের পথ। অনেকে তাকে বিশেষ জ্ঞানী বলে শ্রদ্ধা করে। গোবিন্দ ব্যগ্র হলো, দেখতে হবে সেই পাটনীকে। বিশ্রামের সময পার হবাব পর সে বেরিযে পড়ল খেয়াঘাটের পথে। যদিও গোবিন্দ সংঘের নিয়ম মেনে চলেছে এবং তরুণ ভিক্ষুরা তাকে শ্রদ্ধা করে, তবু তার হৃদয়ের অস্থিরতা শান্ত হয়নি, তার খোঁজা পরিতৃপ্ত হয়নি।

নদীর ঘাটে পৌঁছে গোবিন্দ বৃদ্ধ পাটনীকে বলল নদী পার করে দিতে। ওপাবে পৌঁছে গোবিন্দ পাটনীকে বলল, "ভিক্ষু ও তীর্থযাত্রীদের প্রতি তোমাব সহানুভূতির শেষ নেই। তুমি আমাদের অনেককে পার করে দিয়েছ। আমাদের মতো তুমিও কি ঠিক পথ খুঁজে বেড়াচ্ছ না ?"

সিদ্ধার্থের ক্ষীণ চোখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, "হে

পূজনীয় শ্রমণ, তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, পরেছ গৌতম-শিষ্যের গেরুয়া পোষাক,—তবু এখনো কি তুমি শুধুই খুঁজে বেড়াচ্ছ ?"

"সত্যি বৃদ্ধ হয়েছি," গোবিন্দ বলল, "কিন্তু খোঁজার শেষ হয়নি, কখনো হবেও না। শুধু খোঁজাটাই বুঝি আমার ভাগ্য। আমার মনে হয় তুমিও দীর্ঘকাল পথের সন্ধানে ঘুরেছ। তোমার অভিজ্ঞতা আমাকে একটু বলবে, বন্ধু ?"

সিদ্ধার্থ বলল, "তোমার উপকার হবে এমন কি কথা বলব ? শুধু বলতে পারি যে তুমি বোধ হয় বড় বেশি খুঁজছ ; আর সেই খোঁজার ধান্দায় হারিয়ে ফেলেছ পথের নিশানা। তাই জীবন শেষ হয়ে এলো, কিন্তু পেলে না কিছুই।"

"এমন কেন হয় ?"—গোবিন্দ জানতে চাইল।

সিদ্ধার্থ বলল, "এতো খুব স্বাভাবিক যে তুমি খুঁজতে বেরিয়ে যে জিনিসটি খুঁজছ শুধু তা দেখবার জন্যই উৎসুক হয়ে থাকবে। অন্য কিছু দেখতে পাবে না, অন্য কিছু অন্তরে গ্রহণ করতে পারবে না ; কারণ তোমার সামনে আছে একটা লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্য তোমাকে অন্ধ করেছে। খোঁজার অর্থ : একটি লক্ষ্য থাকা ; পাওয়ার অর্থ : মুক্ত হওয়া, উন্মুক্ত অন্তরে সব কিছু গ্রহণ করতে পারা, নির্দিষ্ট লক্ষ্য না-থাকা। তুমি হয়তো প্রকৃতই একজন সন্ধানী ; তাই চোখের নিচে যেসব জিনিস রয়েছে তাদেরও দেখতে পাওনা।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা," গোবিন্দ বলল। "কি বলতে চাইছ?"

সিদ্ধার্থ বলল, "একবার, বহু বৎসর পূর্বে, তুমি এই নদীর তীরে এসে একটি লোককে ঘুমাতে দেখেছিলে। ঘুমন্ত লোকটির পাশে বসে তুমি পাহারা দিয়েছ, কিন্তু গোবিন্দ, তুমি তাকে চিনতে পারোনি।"

বিস্মিত হয়ে ভিক্ষু তাকাল পাটনীর দিকে।

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "তুমি সিদ্ধার্থ? এবারেও তোমাকে চিনতে পারিনি। আবার তোমার দেখা পেয়ে খুবই আনন্দ হলো। তুমি অনেক বদলে গেছ, বন্ধু। এখন কি তুমি খেয়াঘাটের মাঝির কাজ করছ?"

প্রাণ খুলে হেসে উঠল সিদ্ধার্থ। "হ্যাঁ, আমি পাটনী হয়েছি। বহু লোক আছে যারা বদলায়, যারা নানা রূপ গ্রহণ করে। বন্ধু, আমি তাদেরই একজন। গোবিন্দ, আজকের রাতটা তুমি আমার কুটীরে থেকে যাও। এস, তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

গোবিন্দ সেই রাতটা কাটিয়ে দিল সিদ্ধার্থের কুটীরে। ঘুমাল বাসুদেবের শয্যায়। সে যৌবনের বন্ধুকে প্রশ্ন করে করে অনেক কথা জেনে নিল তার জীবন সম্বন্ধে।

পরদিন সকালে বিদায় নেবার সময় একটু দ্বিধার সঙ্গে গোবিন্দ বলল, "সিদ্ধার্থ, যাবার আগে তোমাকে আর একটি

প্রশ্ন করতে চাই। তোমার কি এমন কোনো মতবাদ, বিশ্বাস, অথবা জ্ঞানের উপর আস্থা আছে, যে আস্থা তোমাকে বাঁচতে সাহায্য করে, সাহায্য করে ন্যায় পথে চলতে ?"

সিদ্ধার্থ বলল, "বন্ধু, তুমি তো জান, যৌবনে যখন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বনে বাস করতাম তখন থেকেই গুরু ও শিক্ষার উপর আস্থা হারিয়েছি, গুরু ও তাঁদের মতবাদ পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে এসেছি নতুন পথে। যদিও এর পর থেকে অনেক গুরুর দেখা পেয়েছি, তবু আমার সেদিনের মত বদলায়নি। একটি সুন্দরী গণিকা আমার গুরু ছিল অনেকদিন, একজন ধনী ব্যবসায়ী এবং পাশা খেলোয়াড়ও পেয়েছিলাম শিক্ষক হিসেবে। একদিন বনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ; একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তার তীর্থযাত্রা স্থগিত রেখে পাশে বসে আমাকে পাহারা দিয়েছিল। তার কাছ থেকেও আমি শিক্ষা লাভ করেছি, তার দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই নদী ও বাসুদেব আমাকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা দিয়েছে। বাসুদেব ছিল সাধারণ লোক, চিন্তাশীল দার্শনিক সে ছিল না ; কিন্তু গৌতমের মতো অতি সহজভাবে সকল জিনিসের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারত। বাসুদেব পুণ্যাত্মা, বাসুদেব মহাপুরুষ।"

গোবিন্দ বলল, "সিদ্ধার্থ, আমার মনে হয় তুমি এখনো একটু তামাসা করতে ভালোবাস। আমি বিশ্বাস করি তুমি কোনো গুরুর উপদেশই মেনে চলোনি ; কিন্তু তোমার নিজস্ব

কোনো মতবাদ না থাকলেও জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তোমার কি বিশেষ কতকগুলি চিন্তা ও ধারণা নেই? এমন কোনো জ্ঞান কি তুমি পাওনি যা তোমাকে সুস্থ জীবন যাপনে সাহায্য করছে? যে জ্ঞান তুমি লাভ করেছ সে সম্বন্ধে আমাকে যদি কিছু বলো তাহ'লে অত্যন্ত আনন্দিত হবো।"

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, অনেক সময় নতুন ভাবনা এসেছে আমার মনে; হয়তো উপলব্ধি করেছি নতুন কোনো জ্ঞান; কিন্তু আজ সকল কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলা কঠিন হবে। গোবিন্দ, যে কথাটি সবচেয়ে গভীর ছাপ দিয়েছে আমার মনে তা হলো এই: জ্ঞান কাউকে শেখানো যায় না, দেওয়া যায় না। জ্ঞানী ব্যক্তি যখন জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা করেন তখন সে চেষ্টা আমার কাছে নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়।"

"তুমি কি পরিহাস করছ?"—গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল।

"না, পরিহাস নয়; সারা জীবন খুঁজে যা আবিষ্কার করেছি তোমাকে তা বলেছি। বিদ্যা অন্যকে দেওয়া যায়, জ্ঞান দেওয়া যায় না। জ্ঞান নিজের সাধনার দ্বারা লাভ করতে হয়; যিনি জ্ঞান লাভ করেছেন তাঁর জীবন জ্ঞানে পূর্ণ হলেও এবং জ্ঞানের সাহায্যে বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারলেও সে জ্ঞান কাউকে দান করতে পারবেন না। যোগ্যতম শিষ্যকেও শিখিয়ে দেওয়া যায় না জ্ঞানের রহস্য। যৌবনেই এ সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ ছিল, তাই গুরুর শিক্ষা ত্যাগ করে চলে এসে-

ছিলাম। গোবিন্দ, প্রত্যেক সত্যের বিপরীতটাও সমান সত্য ; —হয়তো একথা তুমি পরিহাস অথবা আমার নির্বুদ্ধিতা বলে মনে করবে। কিন্তু আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি। একমাত্র আংশিক সত্যকেই কথায় প্রকাশ করা যায়। যা কিছু আমরা চিন্তা করি বা কথায় প্রকাশ করি তা সত্যের একাংশ মাত্র : সত্যকে প্রকাশ করলেই তার সমগ্রতা, পূর্ণতা এবং ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়। বুদ্ধ যখন উপদেশ দিয়েছেন শিষ্যদের তখন তিনি জগৎকে ভাগ করে নিয়েছেন সংসার ও নির্বাণ, মায়া ও সত্য এবং দুঃখ ও মুক্তির মধ্যে। এ ছাড়া উপায় নেই ; যাঁরা শিক্ষা দিতে চান তাঁদের এ পথই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু যে জগতে আমরা বাস করি, যে জগৎ আমাদের চারদিক থেকে বেষ্টন করে আছে তা তো খণ্ডিত নয়! কোনো লোক বা কোনো কাজই সম্পূর্ণরূপে সংসার বা নির্বাণ নয় ; সম্পূর্ণরূপে সাধু কিংবা পাপী কেউ নয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সত্য, এই ভ্রান্ত ধারণার ফলেই আমরা ভুল করি। গোবিন্দ, সময়ের এই বিভাগ প্রকৃত নয় ; বারবার এ সত্য উপলব্ধি করেছি। সময় যদি সত্য না হয়, তাহ'লে বর্তমান জগৎ ও অনন্ত জগতের ব্যবধান, আনন্দ ও বেদনা, মঙ্গল ও অমঙ্গলের পার্থক্যটাও মিথ্যা মায়া”

গোবিন্দ সিদ্ধার্থের কথা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল, "সে কি রকম?”

"শোন, বন্ধু! তুমি পাপী, আমি পাপী, কিন্তু একদিন আমরা নির্বাণ লাভ করব, বুদ্ধত্ব লাভ করব, এই আশ্বাস নিয়ে আছি! অথচ এই 'একদিন' শুধুই মায়া। আজকের সঙ্গে ভবিষ্যতের একটি অনিশ্চিত দিনের তুলনা করে একটু সান্ত্বনা পাওয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। পাপী বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পথে যাত্রা করেনি; মানুষের জীবন তো বিবর্তনের নিয়ম মেনে একটু একটু করে বিকশিত হয না; অবশ্য জানি, একথা সহজে স্বীকার করে নিতে আমাদের অনেকেরই বাধবে। বিবর্তনবাদের প্রশ্ন তোলবার কি প্রয়োজন? ভবিষ্যতের বুদ্ধ তো এখনই আছেন পাপীর অন্তরে; তার ভবিষ্যৎ আছে বর্তমানের মধ্যে। পাপীর মধ্যে, তোমার মধ্যে, সকলের মধ্যে আগামী দিনের যে বুদ্ধ আছেন লুকিয়ে তাঁকে চিনতে হবে। গোবিন্দ, এই সৃষ্টি অসম্পূর্ণ নয়, ধীরে ধীরে পূর্ণতার পথে বিবর্তিত হবার প্রয়োজন নেই এই সৃষ্টির। প্রতি মুহূর্তেই জগৎ পূণ; প্রত্যেক পাপের সঙ্গে আছে ঈশ্বরের কৃপা, প্রত্যেক বালকের মধ্যে আছে ভবিষ্যতের বৃদ্ধ, প্রত্যেক দুগ্ধপোষ্য শিশুর মধ্যে আছে মৃত্যুর বীজ, প্রত্যেক মুমূর্ষুর মধ্যে আছে অনন্ত জীবনের ইঙ্গিত। বুদ্ধ আছেন দস্যুর মধ্যে, জুয়াড়ীর অন্তরে; আবার দস্যুর দেখা পাওয়া যাবে ব্রাহ্মণের মধ্যে। গভীর ধ্যানের সময় কালের ব্যবধান দূর করা সম্ভব হয়; যুগপৎ দেখা যায় সমগ্র অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অখণ্ড রূপ। তখন উপলব্ধি করা যায়

জগতের সবকিছু মঙ্গলময়, ব্রহ্মময়, এবং পরিপূর্ণ। আমার তাই মনে হয় জগতের সবকিছুই শুভ ; জীবন ও মৃত্যু, পাপ ও পুণ্য, জ্ঞান ও নির্বুদ্ধিতা,—সবই ভালো। এদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে ; এদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে নিজেকে, স্বীকার করে নিতে হবে এদের, জগতের ভালো মন্দ সবকিছু সহানুভূতির চোখে দেখতে হবে। তাহ'লে জীবনের পথ সহজ হবে, কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না আমার। দেহ দিয়ে, আত্মার ব্যাকুলতা দিয়ে উপলব্ধি করেছি পাপের প্রয়োজন ছিল আমার জীবনে ; ছিল কামের, সম্পত্তি সঞ্চয়ের ও সংসারের উপর বিতৃষ্ণার প্রয়োজন। এসব অভিজ্ঞতা লাভ না করলে মশগুল হয়ে থাকতাম কোনো এক ত্রুটিহীন কাল্পনিক জগতের স্বপ্ন নিয়ে। জীবনের ভালোমন্দ সকল পথ অতিক্রম করে এসেছি বলে যে সংসারে বাস করি তাকে ভালোবাসতে পেরেছি, সংসারের একজন হতে পেরে সুখী হয়েছি। গোবিন্দ, আমার মনের কয়েকটি কথা তোমাকে বললাম।"

সিদ্ধার্থ নত হয়ে মাটি থেকে ছোট এক খণ্ড পাথর তুলে নিয়ে গোবিন্দের সামনে ধরল। সিদ্ধার্থ বলল, "এই যে পাথর দেখছ এটাই হয়তো একদিন মাটি হবে, মাটি থেকে হবে গাছ, প্রাণী বা মানুষ। আগে আমি হয়তো বলতাম : এই পাথরটা তো শুধুই পাথর ; এর কোনো মূল্য নেই,—কেবল মায়া।

কিন্তু কালচক্রের বিবর্তনের ফলে একদিন এই পাথর হয়তো রূপান্তরিত হবে মানুষ কিংবা আত্মায় ; সুতরাং পাথরেরও মূল্য আছে। পূর্বে এ কথাই মনে আসত। কিন্তু এখন মনে হয় : এই পাথর কেবলমাত্র পাথরই নয়, এর মধ্যে আছে প্রাণী, ঈশ্বর ও বুদ্ধ। আজ পাথর আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হবে বলে এই পাথরের খণ্ডকে ভালোবাসি না অথবা মর্যাদা দেই না ; এই এক টুকরা পাথরের মধ্যে চিরদিন ধরে সবকিছু আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলেই একে ভালোবাসি। আজ এই মুহূর্তে পাথর হিসেবেই একে ভালোবাসি, ভবিষ্যতে কী রূপ হবে সে কথা ভাবছি না ; কারণ আমার কাছে পাথরের এটাই পূর্ণ রূপ। পাথরের প্রতিটি রেখায়, প্রত্যেকটি ছোট গর্তে, হলুদ ও ধূসর রঙে, কাঠিন্যে, শুষ্কতায় কিংবা আর্দ্রতায় আমি দেখতে পাই নতুন অর্থ ও বিশেষ মূল্য। কত বিভিন্ন রকমের পাথর! কোনটা তৈলাক্ত ও মসৃণ, কোনটা সাবানের মতো, একটা হয়তো দেখায় পাতার মতো, আবার কোনটা বালির মতো ক্ষুদ্র ; প্রত্যেকটাই আলাদা, প্রত্যেকেই নিজের মতো করে 'ওম'-এর সাধনা করছে, সকলেই ব্রহ্ম। কিন্তু থাক্, পাথরের কথা আর বলব না। মনের ভাবনা কথায় ভালো করে প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তা অন্যরকম হয়ে পড়ে, অর্থ বিকৃত হয়, একটু যেন নির্বোধ মনে হয়। আমার বেশ মজা লাগে যখন

দেখি একই কথা কারো কাছে খুব মূল্যবান, আবার কারো কাছে তা একান্ত অর্থহীন।”

গোবিন্দ নীরবে শুনল সিদ্ধার্থের কথা।

একটু দ্বিধার সহিত গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, “আমাকে পাথরের কথা বললে কেন?”

“কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বলিনি। উদ্দেশ্য ছিল না বলেই বুঝতে পারছ যে পাথর, নদী এবং সৃষ্টির যত বস্তু চোখের সামনে দেখতে পাই তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসি। এদের কাছ থেকে শিক্ষাও লাভ করতে পারব। গোবিন্দ, আমি এখন পাথর, গাছ ও গাছের বাকল ভালোবাসতে শিখেছি। এরা সৃষ্টির অন্তর্গত বস্তু: বস্তুকেই তো ভালোবাসা যায়, ভালোবাসা যায় না শব্দকে। এ জন্যই উপদেশের মূল্য নেই আমার কাছে; উপদেশের মধ্যে বস্তুর মতো কাঠিন্য নেই, কোমলতা নেই, রঙ্ নেই, আকার নেই, গন্ধ নেই, স্বাদ নেই;—কথা ছাড়া আর কিছু নেই। কেবল কথা আর কথা শুনেছ, তাই বোধ হয় তুমি শান্তি পাওনি। তোমার ধর্ম, তোমার মুক্তি চাপা পড়ে গেছে কথার নিচে। গোবিন্দ, সংসার ও নির্বাণ দুটি শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। নির্বাণ কোনো বস্তু নয়, শুধুই একটি কথা।”

গোবিন্দ বলল, “নির্বাণ শুধু কথা নয়, বন্ধু; নির্বাণ একটি চিন্তা, ভাবনা ও মতবাদ।”

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, “হতে পারে শব্দ চিন্তার বাহন; কিন্তু

বন্ধু, আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমি কথা ও চিন্তার মধ্যে খুব পার্থক্য দেখি না। সত্যি বলতে কি, আমি চিন্তা ও ভাবনাকে খুব বেশি মূল্য দেই না। সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। আমার আগে এই খেয়াঘাটের যে মাঝি ছিল তার কাছ থেকে আমি অনেক শিখেছি। সে ছিল একজন সাধুপুরুষ; তার একমাত্র বিশ্বাস ছিল এই নদীর উপরে, অন্য কিছুর উপর আস্থা ছিল না। সে আবিষ্কার করেছিল যে নদা তার সঙ্গে কথা বলে; নদীর শব্দের মধ্যে সে শুনতে পেত কত কথা; তা থেকে পাটনী শিক্ষা লাভ করেছে। নদী তার গুরু; তার কাছে দেবতার মতো; দীর্ঘকাল সে উপলব্ধি করতে পারেনি যে বাতাস, মেঘ, পাখী, পোকা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি নতুন জ্ঞান; নদীর মতো এরাও দেবতাত্মা, এরাও শেখাতে পারে আমাদের! বনে যাবার আগে বৃদ্ধ পাটনী এই সত্য এবং সকল সত্য জেনে গেছে; গুরুর সাহায্য ছাড়া এবং বই না পড়েও সে তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশি জানত; নদীর উপর গভীর বিশ্বাস ছিল বলেই এত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছিল তার পক্ষে।"

গোবিন্দ বলল, "তুমি যাকে বস্তু বলছ তা কি সত্য, তা কি প্রকৃত? বস্তু কি শুধুই মায়া নয়, শুধুই কি কল্পনা ও ছায়া নয়?"

"তোমার এ প্রশ্নও আমাকে বিচলিত করে না," সিদ্ধার্থ

বলল। "গাছ, পাথর, নদী যদি মায়া হয় তাহলে আমিও তো মায়া; সুতরাং সৃষ্টির সকল বস্তু আমার সহধর্মী, আমরা প্রত্যেকে একই শ্রেণীর। এজন্যই তো তাদের এত সমীহ করি, ভালোবাসি। আমার সগোত্র বলেই তাদের ভালোবাসতে পারি। আমার মতবাদ শুনে তুমি হয়ত হাসবে। গোবিন্দ, আমার মনে হয় ভালোবাসা সংসারের সবচেয়ে বড় জিনিস। বড় বড় দার্শনিকরা পৃথিবীকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন, সংসারের কার্যকারণের চমৎকার ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পৃথিবীকে ঘৃণাও করতে পারেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা এই পৃথিবীকে ভালোবাসা, —তাকে ঘৃণা করা নয়। আমরা কেন পরস্পরকে ঘৃণা করব? আমরা এই পৃথিবীকে ভালোবাসব, এখানকার প্রত্যেকটি প্রাণী ও বস্তুকে ভালোবাসব, সম্মান করব, শ্রদ্ধা করব। এই সৃষ্টির সঙ্গে যাব এক হয়ে।"

গোবিন্দ বলল, "তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। ঠিক একেই বুদ্ধদেব বলেছেন মায়া। তিনি শিখিয়েছেন দয়া, ক্ষমা, করুণা ও ধৈর্য,—কিন্তু শেখাননি প্রেম। পার্থিব প্রেমে জড়িয়ে না পড়তে তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছেন।"

সিদ্ধার্থের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বলল, "আমি জানি, গোবিন্দ, আমি তা জানি। এখান থেকেই শুরু হয় শব্দের দ্বন্দ্ব, অর্থের গোলকধাঁধাঁ; আমাকে স্বীকার করতেই

হবে যে আমার ধারণার সঙ্গে গৌতমের উপদেশের আছে সুস্পষ্ট বিরোধ। এ জন্যই কথার উপর আমার আস্থা কম ; কারণ আমি জেনেছি, অসঙ্গতি ও বিরোধিতা শুধুই মিথ্যা মায়া। আমি উপলব্ধি করেছি গৌতমের শিক্ষার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই ; আমাদের অনুভূতি এক। গৌতম মানব জীবনের অসারত্ব ও ক্ষণস্থায়িত্ব জেনেও মানুষকে এত ভালোবেসেছেন যে এদের দুঃখে সান্ত্বনা দিতে এবং উপদেশ দেবার জন্য নিজের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এত মমতা যাঁর হৃদয়ে তাঁর পক্ষে প্রেমকে অস্বীকার করা কি সম্ভব ? বুদ্ধকেও আমি তাঁর কথা দিয়ে বিচার করব না ; তাঁর জীবন ও কাজের মূল্য তাঁর উপদেশের চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশি। তাঁর মতামতের চেয়ে হাত নাড়বার ভঙ্গীটির মূল্য আমি বেশি দেই। বুদ্ধদেব তাঁর শিক্ষা এবং উপদেশের জন্য আমার শ্রদ্ধা লাভ করেননি, তিনি মহাপুরুষ হয়েছেন তাঁর কাজ ও জীবনের জন্য।"

দুই বৃদ্ধ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর গোবিন্দ যাত্রার উদ্যোগ করে ধীরে ধীরে বলল, "সিদ্ধার্থ, তোমার চিন্তা ও ভাবনাগুলি বলবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমার অনেক কথাই সম্পূর্ণ নতুন লাগল। এখনই আমি সব কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। সে যাই হোক, তোমাকে ধন্যবাদ ; তোমার দিনগুলি শান্তিময় হোক।"

গোবিন্দ মনে মনে ভাবছিল : কি বিচিত্র মানুষ এই সিদ্ধার্থ, কি অদ্ভুত তার মতামত! তার ধারণাগুলি অনেক সময় পাগলামি মনে হয়। ভগবান তথাগতের শিক্ষার সঙ্গে কত গভীর পার্থক্য! তাঁর শিক্ষা স্পষ্ট, সরল, সহজেই বুঝতে পারা যায়; তাঁর শিক্ষার মধ্যে অদ্ভুত বা হাস্যকর কিছু নেই। কিন্তু সিদ্ধার্থের হাত ও পা, তার চোখ, তার ভ্রূ, তার শ্বাস-প্রশ্বাস, তার হাসি, তার অভিবাদন, তার চলবার ভঙ্গী আমাকে নতুন ভাবে আকর্ষণ করে। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর গোবিন্দ সিদ্ধার্থ ছাড়া এমন আর কাউকে দেখেনি যাঁর দিকে চেয়ে বলা যায় : ইনি একজন সাধু পুরুষ! তার মতামত অদ্ভুত হতে পারে, তার কথাবার্তা অনেক সময় হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু তার দৃষ্টি ও হাত, ত্বক ও কেশ থেকে যে পবিত্রতা, শান্তি, স্থৈর্য, কোমলতা ও পুণ্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর আর কারো মধ্যেই সে তা দেখতে পায়নি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে গোবিন্দের মনে জেগেছে দ্বন্দ্ব; তবু সিদ্ধার্থের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করল সে। সিদ্ধার্থের অচঞ্চল মূর্তির সামনে গোবিন্দ ধীরে ধীরে মাথা নত করল।

গোবিন্দ বলল, "সিদ্ধার্থ, আমরা বৃদ্ধ হয়েছি; এ জীবনে আমাদের হয়তো আর দেখা হবে না। বন্ধু, আজ দেখছি তুমি শান্তি পেয়েছ। বুঝতে পারছি, আমি সে শান্তি পাইনি। বন্ধু, আর একটি কথা আমাকে বলো,—যে কথা আমি হৃদয়ঙ্গম

করতে পারব, বুঝতে পারব! জীবনের বাকী পথ চলবার জন্য কিছু পাথেয় দাও, সাহায্য করো আমাকে! আমার পথ বড় দুর্গম, বড় অন্ধকার মনে হয়। আলো দাও, আশা দাও তোমার বন্ধুকে!"

সিদ্ধার্থ নীরবে চোখ তুলে চাইল; মুখে প্রশান্ত হাসি। গোবিন্দ উৎকণ্ঠা ও আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। দীর্ঘ দিনের ক্লেশ, অবিরাম খোঁজা ও ক্রমাগত ব্যর্থতা গোবিন্দের মুখের উপর গভীর রেখাপাত করেছে।

সিদ্ধার্থ তা লক্ষ্য করল; মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

গোবিন্দের কানে চুপি চুপি বলল, "মুখ নত করো; এসো, আরো, আরো কাছে এসো! গোবিন্দ, আমার কপালে চুমো দাও।"

বিস্মিত হলো গোবিন্দ ; তবু কী এক মহৎ প্রেম তাকে যেন বাধ্য করল সিদ্ধার্থের নির্দেশ পালন করতে। গোবিন্দ ঘন হয়ে এলো সিদ্ধার্থের কাছে, নত হয়ে তার ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল সিদ্ধার্থের কপাল। আর তৎক্ষণাৎ কী এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটল তার মধ্যে! তখনো গোবিন্দ মনে মনে বিচার করে দেখছিল সিদ্ধার্থের অদ্ভুত কথাগুলি, সময়ের অখণ্ডতা উপলব্ধি করবার জন্য তখনো সে বৃথা চেষ্টা করছে, কল্পনা করতে চেষ্টা করছে সংসার ও নির্বাণ এক; বন্ধুর প্রতি

গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জেগে উঠেছে, তবু সিদ্ধার্থের অদ্ভুত কথাগুলি যে অবজ্ঞার ভাব এনে দিয়েছিল তার মনে তা এখনো একেবারে দূর হয়নি। গোবিন্দের মনে যখন এমনি বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাত চলছে তখন সেই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটল :

সে আর সিদ্ধার্থের মুখ দেখতে পেল না। তার বদলে দেখল অন্য মুখ, অনেক মুখ, দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ মুখ, অবিরাম মুখের স্রোত,—শত শত, সহস্র সহস্র ; একবার ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়, তবু মনে হয় একটি মুখও হারায়নি, সব আছে স্রোতের মধ্যে ; প্রত্যেকটি মুখ ক্রমাগত রূপ পরিবর্তন করে নতুন হয়ে উঠ্‌ছে, তবু সবই যেন সিদ্ধার্থের মুখ। গোবিন্দ দেখল একটি মাছের মুখ, বিরাট হাঁ করে আছে ; দেখল আর একটি মৃতপ্রায় মাছ, যার চোখের দীপ্তি এসেছে ম্লান হয়ে। তারপর ভেসে উঠল একটি নবজাত শিশুর রক্তিম মুখ, কান্নার উপক্রমে সে মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। দেখতে পেল একজন খুনী একটি লোকের বুকে ছোরা বসাচ্ছে ; আবার সেই মুহূর্তেই দেখল হত্যাকারীকে বন্দী করা হয়েছে, সে নতজানু হয়ে বসেছে মাটির উপরে; জল্লাদ এক আঘাতে তার মাথা কেটে ফেলল। আবার দেখতে পেল কামোন্মত্ত নরনারীর ছবি। ভেসে এলো শীতল, বিকৃত মৃতদেহের মিছিল। কত প্রাণীর মাথা পর পর ভেসে এলো তার চোখের সামনে,—শূকর, কুমীর, হাতী, ষাঁড়, পাখী। সেই নিরবচ্ছিন্ন মুখের স্রোতধারার মধ্যে গোবিন্দ দেখতে পেল

কৃষ্ণ ও অগ্নিদেবকে। এই বিচিত্র মুখ ও আকারগুলি পরস্পরের সহিত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ, প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করছে, ভালোবাসছে, ঘৃণা করছে, ধ্বংস করছে,—আবার নতুন রূপ নিয়ে নতুন জীবন লাভ করছে। প্রত্যেকেই মরণশীল, প্রত্যেকেই যেন ক্ষণস্থায়ী জীবনের ব্যাকুল ও বেদনাদায়ক উদাহরণ। তবু কারো মৃত্যু নেই, তাদের শুধু রূপ বদল হয়, প্রতি মুহূর্তে তারা নতুন জীবন লাভ করে, নতুন মুখ পায়; একটি মুখ থেকে আব একটি মুখের মধ্যে আছে শুধু একটি সূক্ষ্ম সময়ের পর্দার ব্যবধান। সেই অসংখ্য আকার ও মুখ স্থির হয়ে থাকে, স্রোতের মতো বয়ে যায়, নতুন রূপ লাভ করে, কখনো পাশ কাটিয়ে ভেসে চলে যায়, কখনো বা একে অন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়; সেই অসংখ্য আকার ও মুখের উপর সারাক্ষণ ভাসছে একটি পাৎলা কাচ বা বরফের মতো আবরণ, অথবা স্বচ্ছ চামড়া কিংবা খোলসের সূক্ষ্ম পর্দা, অথবা জলের মুখোসের মতো স্বচ্ছ কোনো আবরণ ঢেকে রেখেছে মুখের মিছিল; এই আবরণ অস্পষ্ট, তবু মিথ্যা নয়। যে মুহূর্তে গোবিন্দ সিদ্ধার্থের কপালে চুমো দিয়েছে সে মুহূর্তে গোবিন্দ দেখল বন্ধুর মুখ জলের মুখোসের মতো স্বচ্ছ হয়েছে, এবং সেই স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে দেখতে পেল মুখ ও আকারের বিচিত্র অবিরাম শোভাযাত্রা! গোবিন্দ দেখতে পেল সিদ্ধার্থের মুখের উপর একটি স্বচ্ছ হাসির আবরণ, এই হাসি অসংখ্য প্রবহমান মূর্তিকে এক সূত্রে গেঁথে

রেখেছে, সহস্র সহস্র জন্ম-মৃত্যুকে এই হাসি দিয়েছে সমকালীনতা। গোবিন্দের মনে হলো সিদ্ধার্থের এই আশ্চর্য হাসি অবিকল বুদ্ধের শান্ত, কোমল, দুর্জ্ঞেয়, বিজ্ঞ, করুণাব্যঞ্জক অথবা বিদ্রূপাত্মক হাসির মতো বিচিত্র গুণ সম্পন্ন। কতবার বুদ্ধদেবের মুখে এই আশ্চর্য হাসি দেখে বিস্মিত হয়েছে গোবিন্দ। আজ সেই হাসি সিদ্ধার্থের মুখে দেখতে পেল।

গোবিন্দ ভুলে গেল সময়ের অস্তিত্ব, ভুলে গেল মুখের মিছিল সে দেখেছে শুধু এক মুহূর্ত অথবা এক শতাব্দী ধরে; সে সিদ্ধার্থকে দেখেছে না গৌতমকে তা আর মনে পড়ে না; স্বর্গের একটি তীর গভীর ভাবে বিদ্ধ করেছে গোবিন্দকে, সেই আঘাত তাকে দিয়েছে আনন্দ, সম্মোহিত করেছে, উল্লসিত করেছে। এই মাত্র যে মুখ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল মুখ ও আকারের রঙ্গমঞ্চ হয়েছিল, সিদ্ধার্থের সেই প্রশান্ত মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে গোবিন্দ কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে রইলো। সহস্র সহস্র মূর্তির ছায়া-মিছিল অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও সিদ্ধার্থের মুখের প্রশান্তি বদলায়নি। ঠিক বুদ্ধের মতো তার মুখে লেগে আছে শান্ত-কোমল হাসি; সে হাসি একটু রহস্যময়,—হয়তো আছে করুণা, হয়তো বা বিদ্রূপ।

গোবিন্দের মাথা শ্রদ্ধায় আরো নত হলো। তার শুষ্ক গাল বেয়ে নেমে এলো অবাধ্য অশ্রুধারা। এক মহৎ, সর্বব্যাপী প্রেমের অনুভূতি তাকে অভিভূত করেছে, সে অভিভূত হয়েছে

বিনম্র শ্রদ্ধায়। সিদ্ধার্থের অচঞ্চল মূর্তি ও প্রশান্ত হাসির দিকে চেয়ে চেয়ে গোবিন্দের এক সঙ্গে মনে পড়ে গেল জীবনে যা-কিছু সে ভালোবেসেছে, যা-কিছু পবিত্র বলে গ্রহণ করেছে এবং যা-কিছুর মূল্য জীবনে স্বীকার করেছে ; তার সামনে যে লোকটি নিশ্চল হয়ে বসে আছে তার মধ্যে এক হয়ে গেছে গোবিন্দের সকল মহৎ আদর্শ, মহৎ অভিজ্ঞতা :

গোবিন্দ মাটিতে মাথা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

